দ্বিতীয় অধ্যায়

পুরুলিয়া জেলার তফসিলি জাতি : সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

বহুকাল ধরে ভারতবর্ষের বুকে এসেছে নানা জাতির অগণিত মানুষ। বয়ে এনেছে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির ধারা । ভারতের মাটি থেকে তারা আর ফিরে যায় নি। একে অপরের সাথে মিশে গেছে। গড়ে তুলেছে ঐক্যের বন্ধন। তাই কবির সুরে সুর মিলিয়ে বলা যায়-

"কেহ নাহি জানে,কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে ,সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য
হেথায় দ্রাবিড়, চীন-
শক হুন দল পাঠান মোগল
এক দেহে হল লীন। " ('ভারততীর্থ', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ধীরে ধীরে ভারতবর্ষ হয়ে উঠেছে এক তীর্থ ক্ষেত্র। বহু জাতির মিলনক্ষেত্র। ভারতের মিলনভূমিতে আর্য সংস্কৃতির সাথে অনার্য সংস্কৃতির ধারার মেল বন্ধন ঘটেছে। অনার্য জাতিগোষ্ঠীগুলি কোনো কোনো ক্ষেত্রে আর্যভাষা গ্রহণ করেছে। তারা নিজেদেরকে হিন্দু সমাজের সবচেয়ে নিচু তলার লোক বলে মনে করেছে। তাদের পরিচিতি হল অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ হিসাবে। অন্ত্যজ শ্রেণির লোকেরাই আজকে তফসিলি জাতি রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় :

নৃতত্ত্বগত দিক দিয়ে বাংলার আদিম অধিবাসী আদি অস্ত্রাল বা প্রোটো অস্ট্রালয়েড শ্রেণির মানুষ । বর্তমানে বাংলার উপজাতিগুলি আদিম অধিবাসী। এই জাতির লোকেরা বেঁটে, এদের গায়ের রঙ কালো, এদের মাথা লম্বা থেকে মাঝারি। নাক চওড়া ও চ্যাপ্টা। এদের চুলের রঙ তামাটে কিন্তু ঢেউ খেলানো । সাঁওতাল, ভূমিজ, মুণ্ডা ইত্যাদি এই প্রোটো আস্ট্রালয়েড গোষ্ঠীর লোক।

অস্ট্রিক গোষ্ঠীর পর বাংলায় এসেছিল দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষ এবং তারাও এখানে বসতি গড়ে তুলেছিল। তারা ভূমধ্য সাগরীয় নরগোষ্ঠী। তারা দ্রাবিড় ভাষায় কথা বলত বলে তারা দ্রাবিড় জাতি নামে অভিহিত। এদের আকার মাঝারি, মাথা লম্বা, পাতলা গড়ন। তাদের নাক ছোট, গায়ের রং কালো। রিসলে মনে করতেন বাঙালির জাতির নৃতাত্ত্বিক গঠন দ্রাবিড় জাতির মিশ্রণে সৃষ্ট।

আলপীয় জাতির মানুষরাও এসেছিল বাংলায়। ক্ষেত্র বিশেষে এদের সঙ্গে অস্ট্রিক বা আদি অস্ট্রাল বা দ্রাবিড়দের সাথে কিছু মিশ্রণ ঘটেছিল। উচ্চ শ্রেণির বাঙালিরা আলপীয় পর্যায়ভুক্ত হলেও সঙ্করায়ন ঘটেছিল বাঙালির । এদের ভাষা আর্য। এদের গায়ের রঙ ফর্সা হলেও বাদামি আভাযুক্ত। এদের মাথা গোল বা বিস্তৃত। এদের চুল ও চোখ কালো। দেহ মাঝারি বা দীর্ঘ। তারা মধ্য এশিয়ার পার্বত্য অঞ্চল থেকে এসেছিল।

এরপর ভারতে এল নর্ডিক গোষ্ঠী। এদের ভাষা আর্য ভাষা। উত্তর এশিয়া থেকে তারা ভারতে এসেছিল। তারা উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এদের ছিল বলিষ্ঠ দেহ। এদের গায়ের রঙ ফর্সা। মাথা ছিল লম্বা। এদের ছিল লম্বা নাক আর ভারী দেহ।

উত্তর ভারতে দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে এই নর্ডিক গোষ্ঠীর আর্য ভাষাভাষীর মিশ্রণ ঘটে। ক্ষেত্র বিশেষে আলপীয়রাও আদি অস্ট্রাল ও দ্রাবিড় ভাষাভাষীদের সঙ্গে কিছুটা মিলিত হয়েছিল । কালক্রমে বাংলায় গড়ে উঠল কৌম ভিত্তিক সমাজ। এই কৌম ভিত্তিক সমাজে দেখা দিল বাগদি,বাউরি,ডোম,কৈবর্ত, হাড়ি, রাজোয়াড় ইত্যাদি জাতির মানুষের সমাবেশ। এ থেকেই বলা যায় "বাঙলার জাতিসমূহ যে মাত্র নানাজাতির রক্তের মিশ্রণের ফসল তা নয়, পুনর্মিশ্রণের ফল। "[১]

প্রাচীনকাল থেকে সমাজকে সুষ্ঠুভাবে সচল রাখার জন্য সৃষ্টি হয়েছিল শ্রম বিভাজন। এরই ফলশ্রুতি বর্ণাশ্রমের উৎপত্তি। ভারতবর্ষের সমাজ বিন্যাসের ভিত্তিই হল বর্ণ-বিন্যাস।বৈদিক যুগের জনসমাজকে বিভিন্ন মর্যাদার ভিত্তিতে চারটি শ্রেণিতে বিভাজন করা হয়- ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয়,বৈশ্য ও শূদ্র। এই চতুর্বর্ণের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজকে 'চাতুর্বর্ণ সমাজ' বলা হতো। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের পুরুষ-সূক্ত (১০। ৯০। ২২)তে চতুর্বর্ণ প্রথার উৎপত্তি সম্পর্কে প্রমাণসূত্র রয়েছে। সম্ভবত ঋগ্বেদের উত্তরকালে বর্ণভেদ উদ্ভুত হয়েছিল। চারটি বর্ণের পদমর্যাদার ভিত্তিতে কর্ম বিভাজন করা হয়েছিল। পৌরোহিত্য ও শিক্ষাদান করাই ছিল ব্রাহ্মণদের প্রধান কাজ। ক্ষত্রিয়- রাজন্যবর্গ দেশ রক্ষা ও শাসন কার্য পরিচালনা করতেন। বৈশ্যদের কাজ ছিল কৃষিকাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্য করা । আর শূদ্রদের কাজ ছিল অন্যান্য শ্রেণির লোকেদের সেবা করা ।

ভারতবর্ষের নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস খুব প্রাচীন হলেও বিভিন্ন জাতির প্রথম নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ করা হয়েছিল ১৯০১ সালে। ভারতের নৃতত্ত্ব বিভাগ ও জনগণনার দপ্তরের সর্বময় কর্তা এইচ.এইচ. রিসলে বিভিন্ন কর্মচারীদের নিয়ে এই বৃহৎ কাজটি সম্পন্ন করেন। সেই সময় জাতির কিছু বৈশিষ্ট্য তিনি তুলে ধরেছিলেন।

'জাতি' শব্দটিকে বোঝাতে রিসলের মত উল্লেখ করা যায়-

"A caste may be defined as a collection of families or groups of families bearing a common name, claiming common descent from a mythical ancestor,human or divine, professing to follow the same hereditary calling,and regarded as forming a single homogeneous community." [২]

এইচ.এইচ. রিসলের মতে জাতি হল একটি সাধারণ নাম-বিশিষ্ট কিছু পরিবার বা পরিবার গোষ্ঠী যারা পূর্ব পুরুষ থেকে বংশধারা সূচিত করে এবং একই বংশগত পেশার অনুসরণকারী। এদেরই একই রকম সম্প্রদায় গঠনের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয় জাতি।

তফসিলি জাতি :

সামাজিক কাঠামোর নিম্নধাপের একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে তফসিলি জাতির মানুষ। তফসিলি জাতি বলতে সেই সব জনগোষ্ঠীকে নির্দেশ করে যারা অতীতের জাতিপ্রথার বা বর্ণ অধিক্রমের বহির্ভাগে অবস্থান করতো । তারা সমাজে অস্পৃশ্য ছিল। উচ্চ জাতিদের থেকে পার্থক্য সূচিত হতো এবং সামাজিক স্বীকৃতি লাভে বঞ্চিত ছিল। বাউরি, হাড়ি, বাগদি, মুচি,ডোম,রাজোয়াড়, কৈবর্ত প্রভৃতি জাতির মানুষ এই সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা পশ্চাদপদ বা দলিত বা অবনমিত শ্রেণি হিসেবেও চিহ্নিত। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীই এই সম্প্রদায়ভুক্ত। এদের ছাড়া সমাজ অচল।

১৯৩৫ সালে সর্বপ্রথম সাইমন কমিশন 'তপশিলি বা তফসিলি জাতি' শব্দটির প্রয়োগ করেছেন। অস্পৃশ্য শ্রেণির মানুষদের জন্য এই শব্দের ব্যবহার। ড. বি.আর.আম্বেদকরের মতে প্রাচীন যুগে এদের 'ভগ্ন পুরুষ' বা 'বার্হ্য জাতি'রূপে চিহ্নিত করা হতো । ইংরেজরা দলিত শ্রেণি বলতো। ১৯৩১ সালে জনগণনায় বাইরের জাতি, মহাত্মা গান্ধী

‘ হরিজন’ নামে সম্বোধিত করেন। ১৯৩৫ সালের আইনে অস্পৃশ্য জাতিগুলির বিশেষ কিছু সুযোগ-সুবিধার জন্য একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়।

‘তফসিল’ শব্দটির অর্থ তালিকা। সরকারি তালিকায় যেসব জাতি ও উপজাতি বা আদিবাসীর নাম অন্তর্ভুক্ত তারাই তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি হিসেবে পরিচিত। ভারতীয় সংবিধানের চতুর্থ খণ্ডের ৪৬ নং ধারায় তফসিলি জাতি ও উপজাতি বিষয়টি উল্লিখিত। আধুনিক যুগে আদি দ্রাবিড় বা দলিত শ্রেণিই তফসিলি জাতি । তফসিলি জাতির প্রায় ৪৫% শ্রমিক শ্রেণির। পশ্চিমবঙ্গে মোট ৬০ টি তফসিলি জাতি এবং ৪০ টি তফসিলি উপজাতি রয়েছে।১৭২ টি অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি রয়েছে ।

পুরুলিয়া জেলার তফসিলি জাতি :

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত একটি জেলা পুরুলিয়া।এখানে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে। পুরুলিয়ার মানুষদের নৃতাত্ত্বিকগত পরিচয় নিয়ে আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই আলোচনা শুরু হয়েছিল। সেই আলোচনার সূত্র ধরেই উনবিংশ শতকে রিসলে,হান্টার,ডালটন এবং বিংশ শতাব্দীতে কুপল্যাণ্ড,শরৎচন্দ্র রায়,বিনয় ঘোষ প্রমুখ পণ্ডিত ব্যক্তিরা অগ্রসর হয়েছিলেন। তাদের মতপার্থক্য রয়েছে বিস্তর। আমার গবেষণার কেন্দ্র পুরুলিয়া জেলা ।

নৃতাত্ত্বিকরা প্রধানত তিন ভাগে পুরুলিয়ার জনগোষ্ঠীকে ভাগ করেছেন- তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি।

২০১১ সালের জন গণনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৬০টি তফসিলি জাতির কথা জানা যায়। তার মধ্যে পুরুলিয়া জেলায় বাউরি, বাগদি,রজক, ডোম, হাড়ি, কৈবর্ত প্রভৃতি ৫৩টি তফসিলি জাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। তারা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে আছে ।

তবে বলা যেতে পারে এইসব জনগোষ্ঠীর মানুষ দীর্ঘকাল ধরে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে চলেছে। সমাজ বিবর্তনের সাথে তাদের জীবনেও এসেছে নানা পরিবর্তন। তবুও তারা তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলো এখনও সযত্নে লালন করে চলেছে। তাদের সমাজ-সংস্কৃতির জগতে মিশ্রণ ঘটেছে।

উল্লেখ করার বিষয় হল কয়েকটি তফসিলি জাতি যেমন- কাদার, কামি (নেপালী), দাবগার, কান্দ্রা, কউর, কোঁয়ার, কুরারিয়ার, পালিয়া ইত্যাদি জাতি ক্রমশ আজ অবলুপ্তির পথে।

আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার যুগে, বিশ্বায়নের যুগে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি সংকটাপন্ন। তাদের সমাজ-সংস্কৃতি ধীরে ধীরে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

টেবিল ১-পুরুলিয়া জেলার তফসিলি জাতির শ্রেণি বিভাগ

শ্রেণি	মোট জন সংখ্যা	জনসংখ্যা (পুরুষ)	জনসংখ্যা (মহিলা)	মোট জনসংখ্যা (গ্রাম)	মোট জনসংখ্যা (নগর)
বাগদি,দুলে	১২,৮০০	৬,৫৯৪	৬,২০৬	৮,৯৬৫	৩,৮৩৫
বাহেলিয়া	১৬	৮	১৬	১৬	০
বাইতি	৭৭	৩৮	৩৯	৫৩	২৪
বাউরি	২,৪২,৭৭৩	১,২৩,৯৯১	১,১৮,৭৮২	২,১০,৫৬৬	৩২,২০৭
বিঁদ	৩৫	১৯	১৬	১৯	১৬
বেলদার	২৫	১৩	১২	২	২৩

শ্রেণি	মোট জন সংখ্যা	জনসংখ্যা (পুরুষ)	জনসংখ্যা (মহিলা)	মোট জনসংখ্যা (গ্রাম)	মোট জনসংখ্যা (নগর)
ভোগতা	৮০	৪২	৩৮	৮০	০
ভুইমালি	৩৪৩	১৯১	১৫২	৩৩৭	৬
ভুঁইয়া	২৯,৫৯৮	১৫,০৭৫	১৪,৫২৩	২৭,৬৮৩	১,৯১৫
চামার, চর্মকার, মুচি, মোচি, রবিদাস, রুইদাস, ঋষি	২৫,৮০৪	১৩,১৭২	১২,৬৩২	১৯,৩৬৯	৬,৪৩৫
চৌপল	১৬	৬	১০	১৪	২
দাবগার	১	১	০	১	০
দামাই(নেপালী)	১১	৪	৭	১	১০
ধোবা,ধোবি	২৩,৭৬৩	১২,১৭০	১১,৫৯৩	১৮,১৪৬	৫,৬১৭
দোয়াই	২২	১২	১০	১৬	৬
ডোম,ধাংগাড়	২৮,৬৪৩	১৪,৬২৫	১৪,০১৮	২৪,৭৮৩	৩,৮৬০
দোসাধ, দুসাধ, ধারি,ধাড়ি	১,১৫৯	৬০৬	৫৫৩	৮৭৩	২৮৬
ঘাসি	১৩,২০৭	৬,৬২৯	৬,৫৭৮	১১,১৭৯	২,০২৮
গোঁড়ি	১৭	৮	৯	১২	৫
হালালখোর	৬৩	৩২	৩১	০	৬৩
হাড়ি,মেথর,ভাঙ্গি,বাল্মীকি	৩০,০১২	১৫,২৮৯	১৪,৭২৩	২৭,৪১৭	২,৫৯৫
জালিয়া কৈবর্ত	১৮,২৯৪	৯,২৯৭	৮,৯৯৭	১৪,৭৬৩	৩,৫৩১
ঝালো মালো,মালো	২০	১৩	৭	৬	১৪
কাদার	১	১	০	১	০
কামি (নেপালী)	২	২	০	২	০
কান্দ্রা	৪	৩	১	২	২
ক্যাওরা	৯৪	৪৮	৪৬	২৭	৬৭
কাউর	৯	৪	৫	৪	৫
কেওট,কেইয়ট	৫,২১৫	২,৭১০	২,৫০৫	৪,০৫৫	১,১৬০
খাইরা	১৬	৬	১০	১৬	০
খাটিক	৫৭	৩০	২৭	৪৮	৯
কোঁওয়ার	৫	২	৩	০	৫
কোটাল	১৬৭	৮৪	৮৩	১৬৭	০
কুরারিয়ার	৪	১	৩	৪	০
লালবেগি	৪১	২৬	১৫	১	৪০
লোহার	১৩,০৯৫	৬,৭৯৩	৬,৩০২	৯,৮৮২	৩,২১৩
মাহার	৩২	১৪	১৮	১৬	০
মাল	৫,০০৫	২,৫৫৯	২,৪৪৬	৪,৯৯০	১৫
মাল্লাহ	১১৮	৬৪	৫৪	৫৭	৬১
মুসাহার	১০৯	৫৯	৫০	১০০	৯

শ্রেণি	মোট জন সংখ্যা	জনসংখ্যা (পুরুষ)	জনসংখ্যা (মহিলা)	মোট জনসংখ্যা (গ্রাম)	মোট জনসংখ্যা (নগর)
নমঃশূদ্র	৩৩৮	১৮৬	১৫২	১২৭	২১১
নুনিয়া	১৫৮	৮৫	৭৩	২৯	১২৯
পালিয়া	৮	৬	২	৩	৫
পান,স্বায়াসি	২৪	১৩	১১	৮	১৬
পাসি	৬১৬	৩৩০	২৮৬	২৫৬	৩৬০
পাটনি	২২৯	১০৭	১২২	২২৯	০
পোড,পৌণ্ড্র	১১০	৫৫	৫৫	৩৫	৭৫
রাজবংশী	১৪৪	৬৮	৭৬	৫১	৯৩
রাজোয়াড়	৪৭,১৭৪	২৪,১২৪	২৩,০৫০	৪২,১৮৯	৪,৯৮৫
সরকি (নেপালী)	২৩	১৫	৮	৫	১৮
শুঁড়ি(সাহা)	৪৯,২১৫	২৫,৮৪০	২৩,৩৭৫	৪৭,৮৫৮	১,৩৫৭
তিয়ার	১৬	১০	৬	২	১৪
তুরি	৫৪৪	২৮০	২৬৪	৫৩৬	৮
মোট তফসিলি জাতি	৫,৬৭,৭৬৭	২,৯০,৭৮৯	২,৭৬,৯৭৮	৪,৯০,৫১৭	৭৭,২৫০

টেবিল ২- ২৫,০০০-এর উর্ধ্বে তফসিলি জাতির জনসংখ্যা

শ্রেণি	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা
বাউরি	২,৪২,৭৭৩	১,২৩,৯৯১	১,১৮,৭৮২
ভুঁইয়া	২৯,৫৯৮	১৫,০৭৫	১৪,৫২৩
চামার,চর্মকার,মুচি,মোচি, রবিদাস,রুইদাস,ঋষি	২৫,৮০৪	১৩,১৭২	১২,৬৩২
ডোম,ধাংগাড়	২৮,৬৪৩	১৪,৬২৫	১৪,০১৮
হাঁড়ি,মেথর, ভাংগি, মেথোর,বাল্মিকী	৩০,০১২	১৫,২৮৯	১৪,৭২৩
রাজোয়াড়	৪৭,১৭৪	২৪,১২৪	২৩,০৫০
শুঁড়ি (সাহা)	৪৯,২১৫	২৫,৮৪০	২৩,৩৭৫

টেবিল ৩- পুরুলিয়া তফসিলি জাতির জনসংখ্যা (১০,০০০-২৪,৯৯৯)

শ্রেণি	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা
বাগদি,দুলে	১২,৮০০	৬,৫৯৪	৬,২০৬
ধোবা,ধোবি	২৩,৭৬৩	১২,১৭০	১১,৫৯৩
দোসাধ,দুসাধ,ধারি,ধাড়ি	১,১৫৯	৬০৬	৫৫৩
ঘাসি	১৩,২০৭	৬,৬২৯	৬,৫৭৮
জালিয়া কৈবর্ত	১৮,২৯৪	৯,২৯৭	৮,৯৯৭
ক্যাওট,কেওট	৫,২১৫	২,৭১০	২,৫০৫
লোহার	১৩,০৯৫	৬,৭৯৩	৬,৩০২
মাল	৫,০০৫	২,৫৫৯	২,৪৪৬

টেবিল ৪- পুরুলিয়া জেলার তফসিলি জাতির জনসংখ্যা (১০০-৯৯৯)

শ্রেণি	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা
ভুইমালি	৩৪৩	১৯১	১৫২
কোটাল	১৬৭	৮৪	৮৩
মাল্লাহ	১১৮	৬৪	৫৪
মুসাহার	১০৯	৫৯	৫০
নমঃশূদ্র	৩৩৮	১৮৬	১৫২
নুনিয়া	১৫৮	৮৫	৭৩
পাসি	৬১৬	৩৩০	২৮৬
পাটনি	২২৯	১০৭	১২২
পোড,পৌণ্ড্র	১১০	৫৫	৫৫
রাজবংশী	১৪৪	৬৮	৭৬
তুরি	৫৪৪	২৮০	২৬৪

টেবিল ৫-পুরুলিয়া জেলার তফসিলি জাতির জনসংখ্যা ৫০-৯৯

শ্রেণি	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা
বাইতি	৭৭	৩৮	৩৯
ভোগতা	৮০	৪২	৩৮
হালালখোর	৬৩	৩২	৩১
কাওরা	৯৪	৪৮	৪৬
খাটিক	৫৭	৩০	২৭

টেবিল ৬ পুরুলিয়া জেলার তফসিলি জাতির জনসংখ্যা ৫০-এর কম

শ্রেণি	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা
বাহেলিয়া	১৬	৮	৮
বেলদার	২৫	১৩	১২
বিঁদ	৩৫	১৯	১৬
চৌপল	১৬	৬	১০
দাবগার	১	১	০
দামাই(নেপালী)	১১	৪	৭
দোয়াই	২২	১২	১০
গোঁড়ি	১৭	৮	৯
ঝালো মালো,মালো	২০	১৩	৭
কাদার	১	১	০
কামি (নেপালী)	২	২	০
কান্দ্রা	৪	৩	১
কউর	৯	৪	৫
খাইরা	১৬	৬	১০
কোঁয়ার	৫	২	৩
কুরারিয়ার	৪	১	৩
লালবেগি	৪১	২৬	১৫
মাহার	৩২	১৪	১৮
পালিয়া	৮	৬	২
পান,সাওয়াসি	২৪	১৩	১১
সরকি (নেপালী)	২৩	১৫	৮
তিয়ার	১৬	১০	৬

[২০১১ সালের লোকগণনা (পুরুলিয়া জেলা) থেকে সংগৃহীত]

পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন গ্রামে উচ্চ বর্ণের পাশাপাশি বসবাস করেন তফসিলি জাতির মানুষ। হাড়ি, বাগদি, বাউরি, মুচি, পোদ, তুরি প্রভৃতি জাতিদের নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক দিকটি আলোচনার মধ্য দিয়ে এদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি জানতে পারি।

১.বাউরি

পুরুলিয়া জেলার তফসিলি জাতিদের মধ্যে বাউরি জাতি সংখ্যা গরিষ্ঠ। শহর এবং গ্রামের বিভিন্ন ব্লকে, পঞ্চায়েতে ছড়িয়ে রয়েছে তারা। বাউরি জাতিদের পৃথক পাড়াও রয়েছে। তারা অন্যতম প্রাচীন জনগোষ্ঠী। এই জাতি যে অনার্য তা নৃতাত্ত্বিক লক্ষণ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নৃতাত্ত্বিক পরিচয় : 'বাউরি'জাতিটির সৃষ্টি সম্পর্কে নানা লোককাহিনি রয়েছে। নৃতাত্ত্বিক দিক দিয়ে বিচার করলে এদের গায়ের রঙ, বৈশিষ্ট্য দেখে বলা যায় তারা অনার্য গোষ্ঠীর অন্তর্গত।

একটি লোককাহিনি থেকে জানা যায় যে ভগবানের খাদ্য চুরির অপরাধে বাউরি জাতির অধঃপতন। ভগবানের ভোজ সভায় একজন খাদ্যবস্তু চুরি করেছিল বলে সে শাপগ্রস্ত হয়ে নিম্নজাতিতে পরিণত হয়।সেই থেকে বাউরিরা সবাই অন্ত্যজ সমাজের মানুষ বলে বিবেচিত হয়।

অন্য আর একটি লোককাহিনি হল বাহক-ঋষি (বোঝা বাহক) থেকে এদের উৎপত্তি। বাহক ঋষি তাদের পূর্ব পুরুষ। কোনো এক বিবাহের বরযাত্রায় তারা পালকি বহন করছিল,সেই সময় মালিককে পালকি ফেরত না দিয়ে সেগুলি বিক্রি করে দেয়। মদ্যপান করে এবং গুরুকে অসম্মান করে।মুনি এই অপরাধের শাস্তি স্বরূপ তাদের নিম্ন জাতিতে পর্যবসিত করেন।

'বাউরি' শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে পণ্ডিত মহলে নানা মতভেদ রয়েছে। লোকগবেষক এবং সমাজতাত্ত্বিক পাগল বাউরি তাঁর 'বাউরী জাতির ইতিহাস ও সংস্কৃতি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন –হিন্দীতে 'বাউরা' বা 'বাওরা' শব্দ থেকে 'বাউরী' শব্দটি উৎপত্তি লাভ করেছে। যার আভিধানিক অর্থ 'পাগল'। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন 'বাউরী' শব্দের প্রকৃত অর্থ হতে পারে 'যাযাবর'। বাউরি জাতি সম্ভবত যাযাবর জাতি তা অনুমান সাপেক্ষ। সুবল মিত্র 'সরল বাংলা অভিধান' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন 'বাউরী' শব্দের সংস্কৃত শব্দ হল 'বাগুরা',যার অর্থ- জাল,ফাঁস ফাঁদ,বধ করা। 'বাগুরিক'>বাগুরা-ষ্ণিক(প্রত্যয়)। এর অর্থ দাঁড়ায় ব্যাধ,শিকারী। অর্থাৎ বলা যেতে পারে বাগুরিক >বাউরী শব্দের উৎপত্তি। নৃতাত্ত্বিকদের মতে বাউরিদের বসত কেন্দ্র ছিল বর্ধমান জেলার শেরগড় পরগণা। 'বাউরি' শব্দের অর্থ নিম্নশ্রেণির বাঙালি হিন্দু জাতি বিশেষ।

হিন্দু সমাজে বাউরি সম্প্রদায় ছিল অস্পৃশ্য জাতি। তাদের অস্পৃশ্য ও ঘৃণিত ভাবার কারণ হিসেবে বলা যায় তাদের খাদ্যাখাদ্যের বিচার ছিল না। একসময় তারা মৃত গোমাংস ভক্ষণ করতো।

চেহারার বৈচিত্র্য : নৃতাত্ত্বিক দিক দিয়ে বিচার করলে বাউরি জাতির প্রায় ৭৫ শতাংশ মানুষদের মাথার আকৃতি গোলাকার ধরনের। প্রায় ১২.৫ শতাংশ মানুষের লম্বাটে মাথা এবং বাকি প্রায় ১২.৫ শতাংশ লোকের মাঝারি মাপের মাথা। কারো মতে প্রায় ৮৯ শতাংশ বাউরির নাক মাঝারি মাপের। চেহারার বৈচিত্র্য দেখে অনুমান করা যায় এদের ধমনীতে মুণ্ডা, দ্রাবিড়, আলপাইন গোষ্ঠীর রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে।

সামাজিক বিন্যাস : বাউরি জাতির সামাজিক বিন্যাসে রয়েছে উপসম্প্রদায়, গোত্র, পদবি প্রভৃতি।

ক. উপসম্প্রদায় : বাউরি সমাজে এই জাতির ন'টি বা দশটি উপবিভাগ রয়েছে। সম্প্রদায়ের নাম পেশাগত বা আবাসগত। রিসলের মতে বাউরিরা সাধারণত ন' ধরনের । সুধীর কুমার করণ তাঁর 'সীমান্ত বাংলার লোকযান' গ্রন্থে সম্প্রদায়গুলির নাম- শিখরিয়া, ধুলিয়া বা ধুলো, গোবরিয়া, মালিয়া, কাঠুরিয়া, ঝাঁটিয়া, মল্লভূমিয়া, পঞ্চকোটিয়া, মালুয়া উল্লেখ করেছেন। (পৃ.-৩৬)

কিন্তু 'বাউরী জাতির ইতিহাস ও সংস্কৃতি' গ্রন্থে পাগল বাউরি দশটি ভাগের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল- শিখরিয়া, মানা, পাথরিয়া, ধুলিয়া, মালিয়া, ঝাড়ুয়া, গোবরিয়া, দুলে, বাগদি, বাগালিয়া। (পৃ.-২৭)

দুই জনের আলোচনায় কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করেছি । বলা যেতে পারে সময়ের সাথে সাথে কিছু সংযোজন, কিছু বিয়োজন, কিছু পরিবর্তন ঘটেছে । বাউরি জাতির মধ্যেও উচ্চ-নিচ ভেদাভেদ আছে ।

মানা- মানবাজার থানার বাউরিদের মানা বাউরি বলা হয়।

মল্লভূমিয়া, মালুয়া এবং মোলা -মালভূমে কাঁসাই নদীর দক্ষিণে বসবাস করতো ।

ধুলিয়া- সম্ভবত এসেছে ধলভূম থেকে।

শিখরিয়া- শিখরভূমের বাউরিরা শিখরিয়া নামে পরিচিত ছিল । শিখরভূম হল কাঁসাই ও বরাকর নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল । যেটি ছিল পাঁঞ্চেৎ এস্টেটের অন্তর্ভুক্ত ।

পঞ্চকোটিয়া- বলতে বোঝাতো পাঁচেৎ এস্টেটের কেন্দ্রিয় অঞ্চল। পঞ্চকোটে বসবাসকারী বাউরিদের বলা হতো পঞ্চকোটিয়া ।

গোবোরিয়া- বাউরিদের শ্রেণির মধ্যে এমন এক রীতি আছে যেখানে খাবারের অবশিষ্টাংশ গোবর দিয়ে পরিষ্কার করে । তাই তারা গোবরিয়া নামে পরিচিত। এটি শিখরিয়া উপশ্রেণির বৈশিষ্ট্য ।

ঝাটিয়া- বাউরিদের মধ্যে এক শ্রেণির লোক আছে যারা খাবারের ছোট ছোট টুকরো ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে দিতো । ঝাঁট দেওয়ার জন্য এদের নাম ঝাঁটিয়া ।

খ. গোত্র : বাউরিরা নিজেদের কাশ্যপ গোত্রের অধিকারী বলে মনে করে।

গ. পদবি : বাউরি জাতির পদবি হল বাউরি।

বাসস্থান : পুরুলিয়ার বিভিন্ন ব্লকের গ্রামে গ্রামে বাউরিদের বেশিরভাগ লোক বসবাস করে । এছাড়াও শহরের মধ্যেও তারা বসতি গড়ে তুলেছে। অনেকে একসাথে থাকার ফলে পাড়ার নাম হয়েছে 'বাউরি পাড়া'।

তারা বেশিরভাগ কুঁড়ে ঘরে বাস করে। ঘরগুলো মাটি দিয়ে তৈরি। মাটি থেকে পাঁচ ফুট উঁচু। বাড়িগুলি খুব ছোট ছোট। দোচলা বিশিষ্ট। ছয়-সাত ফুট উঁচু ঝোলান চালের ঝাঁটিবাড় দিয়ে রান্নাঘর থাকে। তাদের বাড়িগুলি এক বা দুই কক্ষ বিশিষ্ট হয়। এদের ঘরে ঢোকার দরজা ছোট আর জানালা পায়রার খোপের মতো দেখতে হয় । ঘরের চালাগুলি খড়,টালি,খাপরায় ছাওয়া ।বাউরিদের মধ্যেই যারা আর্থিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল বর্তমানে তারা ইঁটের পাকাবাড়িতে বসবাস করে। কেউ কেউ অ্যাডবেস্টাস বা টিনের ছাউনি দেওয়া ইঁটের ঘরে বাস করে।

হাঁস ,মুরগি ঘরে ঘরে তারা পালন করে । অনেকে হাঁস,মুরগির জন্য আলাদা খুপরি ঘর বানায়। সেগুলি মাটি,ইঁট,পাথর দিয়ে তৈরি। গবাদি পশু ঘরে রাখলেও এখন আর শূকর পালন করে না ।

খাদ্যভ্যাস : বাউরি সম্প্রদায়ের লোকেরা সহজ,সরলভাবে জীবনযাপন করে বলে তাদের খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে কোনো বাহুল্য নেই। যা জুটে তাই খায়। বাউরি জাতির লোকেরা ভাত ও রুটি খায়। আগে এখানে ধান চাষ ভালো হতো না বলেই মাইলো ঘাঁটা, জুনুর ভাজা, গুঁদলু ঘাঁটা, কলাই সেদ্ধ খেয়েই এদের দিন কাটতো। তারা মাছ, মাংস, ডিম, শাক-সব্জি ইত্যাদি খায় । তবে মাংসের প্রতি এদের লোভ বেশি। মাছ,মাংস খেতে এরা বেশি পছন্দ করে । সারাদিনের ক্লান্তি দূর করার জন্য হাইড়্যা ও মহুয়ার মদ খায় ।

ব্যবহারিক সামগ্রী : গৃহস্থালীর জিনিসপত্র অত্যন্ত সাদাসিধে,সহজমানের । তারা লোহা, মাটির তৈরি বাসনপত্র এখনও ব্যবহার করে। তবে বর্তমানে অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র হয়েছে তাঁদের নিত্যসঙ্গী। এ ছাড়াও কিছু কিছু স্টিলের বাসন এরা ব্যবহার করে থাকে। এদের বেশিরভাগ লোক হাঁড়ি, কলসি, কড়াই, থালা, জামবাটি, গ্লাস, ডেকচি প্রভৃতি তৈজসপত্র ব্যবহার করে ।

দৈনন্দিন কাজের জন্য এরা লোহার কুড়ুল,কাস্তে,দা,খুন্তি, বঁটি ইত্যাদি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে। এরা বল্লম, টাঙ্গি, লাঠি ইত্যাদি লোক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে থাকে ।

সাজ-পোশাক : গ্রামাঞ্চলে পুরুষরা ধুতি, লুঙ্গি, গেঞ্জি পরে । পুরুষেরা মাথায় গামছা দিয়ে পাগড়ি বানায় । বাড়ির বউ, বৃদ্ধা রমণীরা আটপৌরে শাড়ি পরে ঘুরে বেড়ায় । এরা ব্লাউজ ব্যবহার করে । কাজের সুবিধার জন্য অনেকে সাপটা দিয়ে শাড়ি পরে । যে কোনো উৎসব-অনুষ্ঠানে মেয়েরা নতুন পোশাক পরতে পছন্দ করে ।

ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে, যুবক-যুবতী হাল ফ্যাশানের পোশাক পরতে ভালোবাসে। মেয়েরা চুড়িদার, শালোয়ার, কুর্তি, ট্রাউজার, জিনসের প্যান্ট পরে । আর বউরা দোকান থেকে কিনে আনে জরি, চুমকি, পাথর দেওয়া ঝলমলে রঙিন শাড়ি । ছেলেরা বিভিন্ন ধরনের প্যান্ট, জামা, গেঞ্জি পরে থাকে। সময়ের সাথে সাথে পোশাক পরার রুচির বদল তো ঘটবেই। এরা শীতকালে উলের সোয়েটার, চাদর গায়ে দেয় । শীতের রাত্রে কাঁথা, কম্বল, লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোয় ।

প্রসাধন সামগ্রী : বাউরি সমাজের মেয়েরা চুলে লাগায় তেল ও শ্যাম্পু । রং-বেরঙের ফিতে,ক্লীপ দিয়ে নানা পদ্ধতিতে চুল বাঁধে। বাজারে চলতি মুখে মাখার ক্রীম,স্নো,পাউডার,লিপস্টিক,কাজল ইত্যাদি দিয়ে নিজেদের সুন্দরী করে তোলে। হাতে লাগায় মেহেন্দি। ছেলে-মেয়ে উভয়েই গায়ে মাখে সাবান,পাউডার, পারফিউম ইত্যাদি সুগন্ধি প্রসাধন দ্রব্য।

অলংকার : সোনা কেনার মতো সামর্থ্য নেই। তাই এরা বেশি রূপোর গয়নাই কেনে। তবে ইদানিং ইমিটিশানের গয়না তাদের মনের আশা কিছুটা পূর্ণ করেছে। গয়নাগুলো পরলে সোনার মতোই চকচক করে। অনেকে দু'হাতে রঙিন কাঁচের চুড়ি পরে। বয়স্কারা কেউ কেউ রূপোর ও পিতলের গয়না পরে। এদের বিয়েতে সোনা-রূপার গয়না দেওয়ার চলন আছে। বর বরণে সোনার আংটি , গলার চেন দেওয়া বাউরি সমাজের রীতি আছে ।

জীবিকা : এরা কৃষকদের বাড়িতে কৃষি শ্রমিকের কাজ করে থাকে । আগে বাউরিদের জীবিকা ছিল মাছ ধরা । জলাশয়ের উপর নির্ভর করে তারা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতো । কারো কারো মতে প্রথম দিকে বাউরিদের বৃত্তি ছিল পালকি বহন করা। আজ আর পালকিও নেই এদের পালকি বহন করার কাজও নেই । এখন এই জাতির লোক রিকশা, ঠেলা চালিয়ে দিনপাত করতে লাগল। এদের অনেকেই হয়ে উঠল কৃষক বা ক্ষেত মজুর। কেউ কেউ হয়ে উঠল মাটিকাটা শ্রমিক।

বাউরি জাতির মেয়েরা উচ্চবর্ণের লোকেদের ঘরে ঝি-চাকরাণীর কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে । অভাব-অনটনের জ্বালায় এদের কোনো কোনো মেয়ে চলে গেল দূরে খনি ও কলকারখানায় কামিনের কাজ করতে। ইঁট তৈরি, রাজমিস্ত্রীকে ঘর তৈরির মশলা জোগানের কাজেও তারা ব্যস্ত হয়ে থাকল।

পুরুষের চেয়ে এই জাতির মেয়েরাই সংসারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই বেশি রোজগার করে। সংসারে নারীরাই দায়িত্ব সামলিয়ে চলে ।

ধর্ম : বাউরি সম্প্রদায়ের নর-নারীরা হিন্দু ধর্মের লোক । তবে তারা নিজেদেরকে শাক্ত সম্প্রদায়ের হিন্দু বলে দাবী করে । এরা হিন্দু ধর্মের নিয়ম-নীতি মেনে চলে ।

দেব-দেবী : গহন অরণ্য, নদ-নদী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ,হিংস্র বন্য জন্তু প্রভৃতির হাত থেকে রেহাই পেতে এরা পূজা শুরু করে । মূলত তারা প্রকৃতির পূজারি। ভয় ও অজ্ঞানতা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে এদের নানা দেব-দেবী ।

বাউরি জাতির নর-নারীরা মনসা, শিব,ধর্ম ঠাকুর, মা শীতলা, খেলাইচণ্ডী, ভাদু, টুসু ,দুয়ারসিনী ইত্যাদি দেব-দেবীর পূজার্চনা বহুদিন ধরেই করে আসছে। এখনও মানত রেখে দেব-দেবীর পূজা দেয় ।

আদিবাসী সাঁওতালরা বড় বড় পাহাড়কে ' মারাংবুরু'নামে পূজার্চনা করে থাকে। পরবর্তীকালে বাউরিরা 'মারাংবুরু'কে 'বড় পাহাড়ি' নামে পূজা করতে শুরু করে। এইভাবে এক জাতির দেবী অন্য জাতির কাছে পূজা পেতে লাগলেন। জাতিতে জাতিতে ধর্মের মিলনে ঘটল সংস্কৃতির আদান-প্রদান ।

ভানসিংকে ছাগ বলি দেওয়া আর বড়পাহাড়িকে পাখি বলি দেওয়ার রীতি এদের সমাজে প্রচলিত হল।

শনিবার ও রবিবার আখড়াতে শূকর, পাখি, চাল,চিনি ও ঘি অর্পণ করে বাউরি জাতির লোকেরা কুদ্‌রাসিনীর পূজা করে থাকে ।

লোকবিশ্বাস : এদের সমাজে লোকবিশ্বাস হল -

১. বাউরিদের বিশ্বাস ভাত দেখে নতুন বউ ঘরে প্রবেশ করলে কোনোদিন তাদের ভাতের অভাব বা কষ্ট হবে না । তাই বিয়ের পর নতুন বউকে প্রথমেই তারা ঘরে ঢুকতে দেয় না। তাকে কোনো মন্দিরে বা অন্য কারো বাড়িতে রেখে দেয়। পরে অনেক ভাত রান্নার পর ভাতের গাদা দেখিয়ে নতুন বউকে ঘরে ঢুকতে দেওয়া হয়।

২. বাউরি জাতির লোকেরা বিশ্বাস করে নবজাত শিশুকে 'আলহই' খাওয়ালে পোলিও, রিকেট,হাম, ধনুষ্টঙ্কার ইত্যাদি রোগ হবে না। তাই তারা হরিতকি,হলুদ,জাইফল,আঁত মচড়া ও গোসাপের শুকনো মাথা দিয়ে 'আলহাই' তৈরি করে ।

৩. বাউরিরা জাতির লোকেরা আরও বিশ্বাস করে সদ্যজাত শিশুকে ছাগল দুধ খাওয়ালে পোলিও রোগ হবে না । ছাগল দুধকে এরা পোলিওর প্রতিষেধক হিসেবে ভাবে ।

৪. মৃত ব্যক্তির মুখাগ্নিকারী ব্যক্তিরা বিশ্বাস করে সঙ্গে একটি লোহার জিনিস ধারণ করা হলে প্রেতাত্মা তাদের কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

৫. বাউরি জাতির লোকেরা পাখিদের মধ্যে বক ও প্রাণীদের মধ্যে কুকুরকে শুভ বলে বিশ্বাস করে।

লোকসংস্কার : বাউরি জাতির মধ্যে নানা রকম সংস্কার রয়েছে,যা নিজেদের বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ। মানব জীবনে তিনটি প্রধান সংস্কার – জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু। বাউরিদের গৃহে শিশু জন্মানোর পর থেকে দশটি সংস্কারের মধ্যে সাতটি সংস্কার অনুষ্ঠিত হয়। সাধ ভক্ষণ, ন রাত(নব রাত্র), কেশান্ত, নামকরণ, অন্ন প্রাশন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ।

ক. জন্ম-সংস্কার : বাউরি সমাজে শিশু সন্তানের জন্মগ্রহণে অজস্র সংস্কার চোখে পড়ে। যেমন-

১. শিশুর জন্ম গ্রহণের পূর্বে কিছু সংস্কার মেনে চলে। বাউরি জাতিদের মধ্যে প্রসূতিকে সাধ খাওয়াতে হয়। তবে এই রীতি সবার মধ্যে নেই।

২. শিশু জন্ম গ্রহণের দুদিনের দিন বাপের বাড়ি থেকে মা, কাকিমা, পিসিমারা আসেন। প্রসূতিকে ঘি,রসুন, চিঁড়ে ভাজা খাওয়ান।

৩. তিনদিনের দিন প্রসূতিকে ভাত,ডাল,করলা ভাজা, মাছ ইত্যাদি নানারকম তরকারি দিয়ে 'ঝাল-ভাত' খাওয়াতে হয়। বাপের বাড়ির লোক এই খাবার পরিবেশন করে থাকেন।

৪. ন' দিনের দিন হয় 'লারাত'। এই দিন প্রসূতি বাপের বাড়ির মাছ-ভাত খায়। নতুন জামা-কাপড়, থালা, বাটি, গ্লাস, মশারি, তোয়ালে, ছাতা প্রভৃতি জিনিসপত্র শিশুটিকে এনে দেয়। 'লরাত' অনুষ্ঠানটিতে নাপিত ও নাপিত বউ এসে পরিবারের সকলের নখ কেটে দেয়। ধোবা এসে কাপড় কেচে দেয়। ধাইমা শিশু সন্তানকে তেল-হলুদ মাখিয়ে স্নান করান। প্রসূতিকে নিয়ে যান বাঁধের (পুকুর) ঘাটে। ধাইমা, শাশুড়ি,জেঠিমা বাঁধের ঘাটে জড়ো হন। স্নান করে সকলে নতুন কাপড় পরেন।

৫. ষষ্ঠীবট তলায় সকলে পৌঁছায়। মা ষষ্ঠীর উদ্দ্যেশ্যে পূজা দেয়। বালির ওপর মুরগির ডিম রাখে। তার ওপর কাজল, হলুদ ও সিঁদুরের পাঁচটি টিপ দেয়। তার সাথে থাকে আমল-বাসলা। সন্তানের মঙ্গল কামনায় ষষ্ঠীতলায় প্রসূতিকে একফোঁটা বুকের দুধ অর্পণ করতে হয়। পূজার পর মা ষষ্ঠীকে সে প্রণাম করে। পূজার শেষে ধাইমা ডিমটি ষষ্ঠীতলা থেকে তুলে নেন।

৬. প্রসূতি গোরুর গাড়ির চাকাতে তেল, কাজল, সিঁদুর, বুকের দুধ দিয়ে প্রণাম (দণ্ডবৎ) করে। গোরুর গোবর টিকেও সিঁদুর, কাজল, তেল, হলুদ দিয়ে প্রণাম করে। বাড়ি ফিরে বধূরা সবাই আলতা, সিঁদুর পরে থাকে।

৭. একুশ দিনে পালন করে 'একুশার অনুষ্ঠান'। একুশটা পিঠে বটতলায় দিতে হয়।

৮. তারা মন্দিরে পূজা দিয়ে বামুন ঘর থেকে ভাত এনে সন্তানকে খাওয়ায়। এরপর বাড়িতে আত্মীয়স্বজনদের ডেকে খাওয়ানোর রীতি আছে।

খ. বিবাহ-সংস্কার : এদের সমাজের বিবাহ অনুষ্ঠানে অজস্র সংস্কার-বিশ্বাস রয়েছে। যেমন-

১. বাউরি জাতির মধ্যে পণ প্রথা রয়েছে। পূর্বে পাত্র পক্ষ কনে পক্ষকে পণ দিতো। কিন্তু এখন ছবিটা বদলে গেছে। কনে পক্ষ পণ দেয় পাত্র পক্ষকে।

২. বাউরি জাতির স্বগোত্রে বিবাহ প্রথাসিদ্ধ। পাত্র পক্ষের সাত পুরুষের পূর্ব পুরুষ এবং পাত্রীপক্ষের তিন পুরুষের পূর্ব পুরুষের মধ্যে বিবাহ চলে না। এরা মামা-চাচা সম্পর্ক বিচার করে বিবাহের পাত্র-পাত্রী স্থির করে থাকে।

৩. সমাজে বহু বিবাহ ও বিধবা বিবাহ প্রচলিত। স্বামী মারা যাওয়ার পর অনেক সময় বিধবা মেয়ে দেবরকে বিয়ে করে। এই সংস্কার এখনও এদের সমাজে আছে। বাউরি সমাজের পুনর্বিবাহ করার রীতি 'সাঙ্গা' নামে প্রচলিত। কম খরচে সাঙ্গা করা যায়।

৪. বিয়ের সংস্কার হল হাতপলাস্ত, গুয়াটিকা,মুখ দেখানি প্রভৃতি। এইসব অনুষ্ঠান গুলো পালন করে এদের ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দেয়। বিয়ের পর কলাগাছ পুঁতবার রীতি আছে। টাকায় সিঁদুর লাগিয়ে কনের সিঁথিতে ছোঁওয়ানো হয়।

৫. বিবাহের দুইদিন আগে কনের বাড়িতে 'হাতপলাস্ত'বা আশীর্বাদ অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। উঠানে তুলসী তলায় গোবর (ছুঁচ) মাটির মাড়ুলি দেওয়া হয়। সেখানেই পাত্রপক্ষের লোকেদের বসায়। এর পর দুটি শাল পাতায় দুই বেহাই মুখোমুখি বসেন। তাদের দুজনের মাঝে একটি শালপাতা রাখা থাকে। তার ওপর আমপাতা দেওয়া একটি জলপূর্ণ ঘটি বসানো হয়। সেই সঙ্গে থাকে পয়সা ,ধান,দূর্বা,তুলসীপাতা ,গোটা সুপারি,পান,চন্দন ইত্যাদি। উভয়েই নিম্নোক্ত মন্ত্রটি পাঠ করে-

'শ্রী হরি শ্রী হরি বামুনের রূপ ধরি,
স্বর্গ হতে আলেন হরি,
পুঁথি পাঁজি বগলে করি।

অমুকের পাত্র, অমুকের পাত্রী
হলো তারা শুদ্ধ,
বর কনের কত্তারা হলেন

এইভাবে পরস্পর তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। এরপর এক বেহাই বলে ওঠে -

'আজ লে আমার পুত্র লয়, তুমার পুত্র '

দুই বেহাই ঘটিটি ধরে থাকে স্বজাতীয় পুরোহিত তিনবার মন্ত্র পড়ে। দুই জনেই ঘটির জলে চুমুক দিয়ে জল খায় আর আমপাতা দাঁতে কাটে। একে অপরকে আলিঙ্গন করে থাকে।

এরপর কন্যাকে আশীর্বাদ করার তোড়জোড় শুরু হয়। পাত্রপক্ষের লোকেরা আশীর্বাদের এবং গায়ে হলুদের জিনিসপত্র কনেপক্ষের হাতে তুলে দেয়। জিনিসপত্রের মধ্যে থাকে- নানা ধরনের ফল,লাড্ডু,লাল রঙের আশীর্বাদীর শাড়ি ও হলুদ রঙের গায়ে হলুদের দুটি শাড়ি ,কনের সাজগোজের জিনিসপত্র ইত্যাদি। পাত্রপক্ষের দেওয়া শাড়ি পরে

কনেকে তুলসী তলায় নিয়ে আসে। মেয়েটি মুখে ঘোমটা ঢাকা নিয়ে মাদুরে বা পিঁড়িতে বসে। প্রথমে শ্বশুর মশাই মেয়েটির কপালে টিকা দেয়,ফল ও রূপার গয়না দিয়ে আশীর্বাদ করে। তারপর একে একে এসে মেয়েটির মাথায় ধান,দূর্বা ও আঁচলে পয়সা ও ফল দিয়ে আশীর্বাদ করে। পাত্রকেও একইভাবে পাত্রীপক্ষের লোকেরা আশীর্বাদ করে আসে।

৬. আশীর্বাদ হয়ে গেলে বর ও কনের 'গায়ে হলুদ' অনুষ্ঠান হয়। তারপর আইবুড়ো (থুবড়া ভাত) ভাত খাওয়ায়। থুবড়া ভাত খাওয়ার দিন বরের বাড়িতে কনের জামাইদাদা বা পিসেমশাই বা মেসোমশাই লগন ভাঁড় আনতে যান । দুটি ছোট ছোট ভাঁড়ের মধ্যে হলুদ মাখানো চাল,কালো বিউলি বা বিরি কলাই,সুপারি দিয়ে ভাঁড়ের মুখগুলি শালপাতা দিয়ে মুড়ে সুতলি দিয়ে বাঁধা থাকে। এটিকেই 'লগন ভাঁড়' বলে। দুটি ভাঁড়ের একটি কনে ঘরে এলে কনে থুবড়া ভাত খেতে পারে। জামাই ভাঁড়টিতে যতগুলি গিরা (গিঁট) দেবে ততদিন মেয়েটিকে গিরা খুলে থুবড়া ভাত খেতে হয়। এই সংস্কার আজও এদের লোকসমাজে দেখা যায় ।

৭. বৌদি বা দিদি নয় রকমের খাবার রান্না করে খেতে দেয় । ভাত,ভাজা,ডাল,তরকারি মাছ,ক্ষীর-পায়েস ইত্যাদি দিয়ে ছেলে এবং মেয়ে দুজনকেই থুবড়া ভাত খাওয়ানো হয়। । থুবড়া ভাত খাওয়ানোর আগে কিছু কিছু লোকাচার পালন করতে হয়।

৮. গায়ে হলুদের শাড়িটি পরে পাত্রী আলপনা দেওয়া পিঁড়ির ওপর বসে। একটি কাঁসার থালায় আমলা-বাসলা, সিঁদুর, কাজল, হলুদ বাটা, আকন্দ ফুলের মালা, ধান, আলতা, সুপারি সমস্ত জিনিসপত্র সাজিয়ে কনের মা কনের আট অঙ্গে তেল- হলুদ ছোঁওয়ায় এবং তাকে আশীর্বাদ করে। তারপর বাড়ির,পাড়ার মোট সাত জন এয়ো স্ত্রী এসে কনেকে তেল-হলুদ ছোঁওয়ায়। আশীর্বাদ করে।

৯. কনের বৌদি সকাল থেকে উপোস করে থাকে। নতুন কাপড় পরে কনের জন্য ভাত, ডাল, তরকারি, ক্ষীর-পায়েস ইত্যাদি রান্না করে । কনের গায়ে তেল-হলুদ ছোঁওয়ানো হয়ে গেলে তার পায়ে আলতা, চোখে কাজল, গলায় আকন্দ ফুলের মালা পরানো হয় । কপালে চন্দন দিয়ে সাজায়। একটি কুলায় তিনটি শালপাতায় ভাত, তরকারি, ডাল, মাছ, চাটনি, পায়েস দিয়ে সাজিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে একে একে নয় জন এয়োস্ত্রী কনের আট অঙ্গে সেই ভাত ছুঁইয়ে বরণ করে। বরণ করার সময় কনে মাথায় ঘোমটা দিয়ে থাকে যাতে সে ওই ভাত দেখতে না পায়। বৌদি সবার শেষে বরণ করে। কুলো সমেত খাবারটা নিয়ে পিছিয়ে পিছিয়ে বেরিয়ে যায় । এরপর মেয়েটির হাতে সের দিয়ে মেপে চাল দেওয়া হয়। মেয়েটি ঘোমটা দিয়ে মাথা ঢেকে পেছনে মায়ের আঁচলে তিনবার চাল ফেলে দেয় ।

গ. মৃত্যু-সংস্কার : বাউরি সমাজে মৃত্যুকে ঘিরে রয়েছে বিভিন্ন সংস্কার। যেমন-

১. বাউরি সমাজে মৃত ব্যক্তিকে তুলসী তলায় শুইয়ে দেওয়া হয়। এটিকে 'ভুঁই শয্যা' বলে। বাউরিদের ন' দিনে কাপড় কাচা ও দশ দিনে ঘাট হয়। স্বামী জীবিত অবস্থায় বউ মারা গেলে তাকে শাঁখা,সিঁদুর,আলতা পরানো হয়।

২. সাধারণত বাউরি জাতির লোকেরা হিন্দু রীতি অনুযায়ী মৃতদেহ দাহ করে। মৃত ব্যক্তির পা হলুদ জলে ধোওয়ায়। তাদের বিশ্বাস এতে তার আত্মা বেরিয়ে এসে কারো ক্ষতি করতে পারবে না।

৩. শবদেহ নিয়ে যাওয়ার সময় হরি বোল ধ্বনি দেয় আর খৈ, চিঁড়ে ছড়ায়। শ্মশানে পৌঁছাবার কিছুটা আগে মৃতদেহ মাটিতে রাখে। এরপর শবদেহটিকে ঘুরিয়ে নেয়। তার মাথাকে গ্রামের দিকে রেখে শ্মশানে নিয়ে

যেতে হয়। শ্মশানে পৌঁছে শবদেহ মাটিতে রাখে। একটি কাঠিতে সলতে বাঁধে। সেটি ঘিয়ে ভেজায়। আগুন জ্বেলে শবদেহের চারদিকে তিনবার ঘোরে। মৃতদেহটির মুখে আগুন ছোঁওয়ায়। এরপর চিতার উপর মৃতদেহ উল্টো করে শুইয়ে দেয়। মাথা থাকে উত্তর দিকে। চিতায় আগুন লাগানো হয়। শ্মশানযাত্রীরা জ্বলন্ত চিতায় একটি করে কাঠ দেয়। মৃতদেহের যে অংশটি পোড়ে না তা চিতার মাঝখানে পুঁতে দেয়। একটি নতুন হাঁড়িতে চাল,ডাল, বিরি কলাই, কড়ি, শিশু সন্তান মুরগির মাংস দিয়ে চিতার মধ্যে বসিয়ে দেয়। এটিকে 'কাক ভূশুণ্ডি' বলা হয়। চিতার আগুনে সেটি রান্না হয়। তারপর হাঁড়িটি ভেঙ্গে ফেলে। শ্মশানযাত্রীরা কেউ আর চিতার দিকে তাকায় না। এরপর শবদেহ নামানোর স্থানে একটি কাঁটা ডাল, পাথর রেখে দেয়। সবাই সেটি ডিঙ্গিয়ে পার হয়। পুকুরে স্নান করে সবাই বাড়ি ফেরে।

৪. স্বামীর নাম করে মৃত ব্যক্তির বউকে হাতের লোহা মাটি মাখিয়ে দূরে ছুঁড়ে দিতে হয়।

৫. মৃত ব্যক্তির পরিবারের লোকেরা গায়ে তেল মাখে না। রান্নায় হলুদ দেয় না। মাছ,মাংস খায় না। এরপর খোল কীর্তন সহযোগে অস্থি ভাসাতে বের হয়। মৃতের পরিবারের লোকেরা দুদিন শুধু মুড়ি খেয়ে থাকে। দ্বিতীয় দিনে খৈ খাওয়া হয়। তিনদিনের দিন 'তিতা ভাত' খায়। চতুর্থ দিনে 'বেণা গাছ' পুঁতে।

৬. মুখাগ্নিকারী ব্যক্তির সাথে সব সময় লোহার কাস্তে কিংবা কাটারি থাকে। এদের বিশ্বাস মৃতব্যক্তির প্রেতাত্মা তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না।

৭. মুখাগ্নিকারী ব্যক্তিকে হবিষ্যি রাঁধতে হয় । রাতের বেলা সবাই ঘুমিয়ে পড়লে নতুন হাঁড়িতে ভাত রান্না করে । রান্না করা খাবার মৃত ব্যক্তির উদ্দ্যেশ্যে নিবেদন করে। তারপর নিজেরা খেতে পায়। খাবার সময় কোনো শব্দ হলে আর খাওয়া চলে না ।

৮. দশ দিনের দিন ঘাট । ঐ দিন বেণা গাছের কাছে তিল,মাছ পোড়া,তেল ইত্যাদি দ্রব্য রাখে। ঘাটে যারা উঠবে না তারা দিনের বেলায় বেণা গাছের কাছে রাখা দ্রব্য গুলি স্পর্শ করে স্নান করে ফেলে। আর ঘাটে যারা উঠতে চায় তারা সূর্য ডোবার পর ঘাটে এসে উপস্থিত হয় । বেণা গাছ ছুঁয়ে স্নান করে । নতুন জামা কাপড় পরে থাকে ।

৯. ঘাটের দিন চাল,ডাল, তেল,হলুদ,লঙ্কা প্রভৃতি সমস্ত কিছুর মধ্যে মোরগ (সাঁড়া) রক্ত মিশিয়ে খিচুড়ির মতো একটা খাবার বানানো হয়। ঘাটে ওঠার পর পরিবারের সমস্ত সদস্যদের সেই খাবার মুখে ছোঁওয়াতে হয়। যারা উপবাসে থাকতে চায় তারা খাবার জলে ভাসিয়ে দেয়। আর যারা ভাত খেতে চায় তারা মুখে ছুঁইয়ে দেয়।

১০. এগারো দিনের দিন 'তিলপাত' অনুষ্ঠান হয়। বাউরি জাতির মধ্যে কোনো একজন ব্যক্তিকে ঠাকুর সাজানো হয়। সে শ্রাদ্ধের ভাত রাঁধে। তাকে চারটি পাতায় চাল,ডাল ,কাঁসার বাটি, আলতা দেয়। পুরোহিতের আট অঙ্গে তেল-হলুদ ছোঁওয়ায় । দধি মঙ্গল অনুষ্ঠান করে। নতুন ভাঁড়ে দই, হলুদ, সিঁদুর দিয়ে মুখাগ্নিকারী ব্যক্তির মাথায় চাপায়। পুরোহিত সবার মাথায় দই ছিটিয়ে দেয়। মাটিতে ভাঁড়টি আছড়ে ভেঙ্গে ফেলে। তারপর শরীরে জল ঢেলে দেয়। পরিবারের ছেলেরা মাটিতে গড়াগড়ি দেয়।

১১. 'গুষ্টির পিঠা' বানাতে হয়। এই পোড়া পিঠে বাড়ির সবাইকে খেয়ে স্নান করতে হয়। এভাবেই সমস্ত অনুষ্ঠান শেষ হয়। এই সংস্কার এখনও এরা মেনে চলে ।

বিবাহরীতি : বিয়ের দিন সকালবেলা দিদি,জামাইদাদা ছাদ্না তলায় আম ডাল, মহুল ডাল, সিধা ডাল পুঁতে । আলপনা দিয়ে ছামড়া বা ছাদ্নাতলা সুন্দরভাবে সাজানো হয়। ছাদ্নাতলায় একটা কাঁসার থালায় সূঁচ বেঁধানো পানপাতা,কাঁঠাল পাতায়-লোহার খাড়ু (বালা), সিঁদুর, সরিষার তেল, আমলা-বাসলা (আমলা, মেথি,হলুদ গুঁড়ো) ধান,দূর্বা,গোটা সুপারি, খোলা ভাঙা,প্রদীপ প্রভৃতি উপকরণ রাখা থাকে। একটি শিল-নোড়া পাতা থাকে। ছামানি ভাঁড়, জলসাওয়ার হাঁড়ি,খড়ের দড়ি ও একটি সুতা বাঁধা লাটাই থাকে। ছাদ্না তলায় কনের মার কোলে কনেকে বসানো হয়। লাটাইয়ের সুতো কনে ও এয়ো স্ত্রীরা ধরে ধরে খুলতে থাকে আর সাতপাক সুতোটিকে ঘোরায়। এরপর কনে কাজললতা আর বর জাঁতি দিয়ে ভাঁড়ের চোখ ছ্যাঁদা করে। এরপর শিলের ওপর কিছু গোটা সরষে এবং তার ওপর নড়া রেখে তার ওপর পান পাতা দিয়ে সরষের তেল ঢালা হয়। কনে নড়াটি ঘোরাতে থাকে । তার সাথে সাথে এয়ো স্ত্রীরাও কনের হাতটি ধরে থাকে। নড়াটিকে সিধা ডালে ছুঁইয়ে কনের কপালে পাঁচ বার বা সাত বার ঠেকাতে হয়। তারপর কনের বৌদি সরষে ও সরষের তেল কনের গায়ে মাখায়। কনের হাতে জামাইদাদা আমপাতা বেঁধে দেয় । এটিকে 'শীতল বাঁধা' বলা হয়। মা হাত ধরে মেয়েকে ঘরে নিয়ে যায়।

এরপর কনের মা ষষ্ঠী বটতলায় গিয়ে পূজা করে। মাটি দিয়ে মাড়ুলি দেয়। সেখানে সিঁদুর,তেল,কাজল,হলুদের দাগ দেয়। ধূপ জ্বালে, প্রদীপ দেখায় , ধূপের চারপাশে লাটাইয়ের সুতো দিয়ে ঘুরিয়ে সেটি বেঁধে দেয়। তারা এভাবে ষষ্ঠী মাকে বেঁধে রাখে।

কারো ঝারা বারা থাকলে মা কাঁখে কলসি নেয় আর কনের মাথায় ফুটো করা হাঁড়ি চাপায় । কনের মাথায় হাঁড়িটি ধরে থাকা হয়। অল্প অল্প জল ঢালতে ঢালতে কনেকে নিয়ে বটতলায় পূজা দেওয়া হয়।

জল সাইতে যাওয়ার সময় রাস্তায় বামুন ঘরের সামনে মাড়ুলি দিতে হয় । তারা বামুন ঘরের উঠোনে জলসাওয়া হাঁড়িটা নামায় । তারপর চাল,ডাল,তেল,হলুদ ইত্যাদি জিনিসপত্র বামুনকে দেয়। বামুন ভাঁড়ে নয় পোয়া জল দেয় । এরপর বামুন ঘরের জল নিয়ে বাঁধের ঘাটে যায়। মা থালায় ডিম,সিঁদুর, কাজল,ধান,দূর্বা নিয়ে বাঁধের ঘাটে পৌঁছোন। জামাইদাদা দা দিয়ে জল কাটে। কনের মা ঘাটে মাটির ওপর ডিম রেখে তাতে সিঁদুর,কাজলের দাগ আঁকেন। পূজা করে মাটি ফেলে ডিমটা তুলে নেয়। পুকুর বা বাঁধের জল দিয়ে ভাঁড়টি ভরা হয়।

জল সেজে আসার পর একটা ছোট ভাঁড়ে সুপারি দেওয়া হয়। এক হাতে খড়,এক হাতে পান দিয়ে কনের বুক সেঁকে। এরপর মেয়েটি বাম পায়ে ছোট খোলা ভাঙ্গে। সেই সময় তাকে বড়রা প্রশ্ন করে- 'কার চোখ ছ্যাঁদা ?' এভাবে তিনবার প্রশ্ন করা হয়। মেয়েটি তিনবার উত্তর দেয়-বরের নাম বলে 'উয়ার চোখ ছ্যাঁদা।''উয়ার চোখ ছ্যাঁদা। 'উয়ার চোখ ছ্যাঁদা'।

বিয়ের দিন বর মায়ের দুধ খেয়ে বিয়ে করতে আসে। বিয়ে করতে এসে বর প্রথমেই দুর্গা মন্দিরে যায়। প্রণাম করে এলে প্রথমেই কনের ঘরে ঢুকবে না। কনে ঘর থেকে ১০১ টাকা এনে ড্রাইভারকে দিলে জানালা খুলে বরকে মিষ্টি খাওয়ানো হয়। পান দিয়ে, শাঁখ বাজিয়ে শাশুড়ি,জেঠি শাশুড়ি বরের বুক সেঁকে। বরকে কোলে করে পাত্রীর পক্ষের লোকেরা জামাইদাদা বা বাবা ঘরে নিয়ে আসেন।

বরকে ছামড়া তলায় দাঁড় করায়। কনের মা,কাকিমা,মাসিমা এদের সকলের পা বর জল দিয়ে ধোওয়ায় । এরপর বরের মুখ মলমলের কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়। বরের বাড়ির আর কনে ঘরের দুটি বাচা ডালির ওপর কনেটিকে বসানো হয়। বরের ঘরের একজন এবং কনের ঘরের এক জন, দুজনে মিলে কনেকে ছাদ্না (ছামড়া) তলায় নিয়ে এসে দাঁড় করায়। মেয়েরা সাততী ঘোরে। কনের মুখ পান দিয়ে ঢাকা থাকে আর আঁচলে থাকে চাল।কনের মা একটি থালায় পান পাতা, প্রদীপ, কুলায় আট কলাই নিয়ে বরের চারদিকে ঘোরে। তার সাথে সাথে কনে এবং সাত বা নয় জন

এয়ো স্ত্রীরাও সাত বার ঘুরতে থাকে। ঘুরতে ঘুরতে কনের মা থালায় পান পাতা দিয়ে জামাইয়ের বুক সেঁকে, কেউ আমপাতা দিয়ে জলের ছিটা দেয়। কেউ আমপাতার বোঁটায় কাপড়ে বেঁধে আগুন ধরিয়ে ঘুরতে থাকে। এরপর পানপাতা সরিয়ে বর-কনের শুভদৃষ্টি বিনিময় হয়। তারপর কনেকে আল্ল খাওয়ায়। এরপর শুরু হয় বিয়ের পর্ব।
এই পর্বগুলি হল-

মালাবদল : মেয়ের জামাইবাবু পৈতায় সুপারিকে ফুটো করে মালা তৈরি করে। প্রথমে আকন্দ ফুলের মালা এবং গুয়া-পৈতার মালা বদল হয়। মালা বদলের সময় তিন বার হরি বোল করতে হয়। এরপরে রজনীগন্ধার মালাও একাজে ব্যবহার করা হয়। বর তার কপালের সিঁদুর কড়ে আঙ্গুলে করে কনের সিঁথিতে আর কনে তার কপালের সিঁদুর ছেলের কপালে দেয়। একাজ তিনবার করে হয়। এরপর কনের মা থালা নিয়ে বর-কনেকে বরণ করে। দুজনের কপালে লোহার খাড়ু (বালা)ছোঁওয়ায়,কাঁঠাল পাতার খোলা ছোঁওয়ায়,ছোট কুলা নিয়ে বরণ করে দুদিকে কুলাটা ফেলে দেয়।তারপর বর কনেকে বসানো হয়। কনের দাদা জামাইকে আংটি -বরণ করে অনামিকায় আংটি পরিয়ে দেয়।

কহবর : বিয়ের পর বর-কনেকে বাসরঘরে নিয়ে আসা হয়। শ্যালিকারা জামাইয়ের পা ধোওয়ায়। জামাইয়ের পায়ের বুড়ো আঙ্গুল ধরে রেখে পাওনা চায়। এটিকে ' খাঁকড়ি ধরা' বলে। এরপর বর-কনে একে অপরকে মিষ্টি খাওয়ায়।

গাঁটবন্ধন : সকাল বেলায় কনে বিদায়ের পূর্বে বর ও কনে দুজনকে মাছ-ভাত খাওয়ানো হয়। একে অপরকে এঁটো খাবার খেতে হয়। ছামড়া তলায় দুজনকে নিয়ে গিয়ে বসায়। নিত বর বর-কনের গাঁটছড়া বেঁধে দেয়।

বাঁদানি : পরিবারের, পাড়ার এয়ো স্ত্রীরা আমলা বাসলা (আমলা,মেথি,হলুদ গুঁড়ো),সুপারি, ধান-দূর্বা দিয়ে বর-কনেকে আশীর্বাদ করে। দুটি কাঁসার থালায় বর- কনেকে যৌতুক দেয়। বর ও কনে দুজনে বড়দের প্রণাম করে।

ছামানী ভাঁড় : কনে বাম হাত দিয়ে ছামানি ভাঁড় স্পর্শ করে ভিতরের বস্তুকে বাম হাত দিয়ে নেড়ে দেয় আর বর ঢাকনা লাগাতে লাগাতে যায়। এভাবে সাত বার খেলাটি খেলতে হয়।

বিদায় : এরপর সের দিয়ে চাল মেপে কনের হাতে দেয়। কনে পেছন দিকে মাথার ওপর দিয়ে 'ভায়ের ঘর ভরলি' বলে চালগুলো ফেলে দেয় মায়ের আঁচলে। কনে মায়ের বুকের দুধ খায়। তারপর ভাইফোঁটা দেয়। বাম হাতে প্রথমে প্রাচীরে ফোঁটা দিয়ে সব ভাইদের বুকে ফোঁটা দেয়। খোলা না নাড়লে ঘর ছাওয়াতে পারে না। তাই বিদায়ের পূর্বে ঘরের চালের খোলা নাড়তে হয়। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে বর কনেকে পেছন দিকে ধরে থাকে এবং মেয়েটি এক আঁজলা চাল নেয়। তাকে প্রশ্ন করে ' কার ঘর ভরলি?' মেয়েটি 'ভায়ের ঘর ভরলি' বলে দুপায়ের ফাঁক দিয়ে চালটা ছুঁড়ে দেয়। আর সে পেছনে তাকায় না। এরপর মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে 'বিটি কথা যাছিস্?' কনেকে তিন বার বলতে হয় ' কামিন খাটতে যাছি'। বর-কনেকে বিদায় জানায়। তারা দুজনে মিলে প্রথমে মন্দিরে তারপর বটতলায় প্রণাম করে গাড়িতে বসে। মাসি,কাকিমা বর-কনেকে মিষ্টি জল খাওয়ান। ভাইরা গাড়ির চারটি চাকায় জল দেয়। তারপর গাড়িটাকে ঠেলে দেয়। গাড়ি চলতে শুরু করলে তারা আর পেছন ফিরে তাকায় না। বিদায় মুহূর্তে কনের মা বলে ওঠেন-

"রাণীকে যে মানুষ কল্ল্যম
দুধের সর খাঁওয়ায়ে
সেই রাণী চল্যে যাচ্ছে
সংসার কাঁদায়ে।।"

কুলহির মোড়ে পৌঁছোলে বরের বাড়ির লোকজন গুড় ও জল দিয়ে মাখানো চিঁড়া নিয়ে আসে। গাড়িতে বসে থাকা বর-বধূকে তারা উঁকি দেয় । বউকে চিঁড়া খাওয়ায় । তারপর সরে পড়ে । একে 'বউ হুলকা' বলে। এরপর গাড়ি থেকে নামিয়ে বর-বধূকে কোলে করে ঘরে নিয়ে আসে। তারপর ননদ বধূর কাঁখে কলসি দিয়ে পাওনা চায়। পাওনা না দিলে সে কলসি নামাতে চায় না। একটি পিঁড়ায় দুজনে বাম পা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বর-বধূ দুজনে বড়দের জল দিয়ে পা ধোওয়ায়। বরের মা বরণের থালা এবং এয়োস্ত্রীরা আম বোঁটার সলতে ডান হাতে নিয়ে সাততী ঘোরে। ঘুরতে ঘুরতে বরের মা বর-বধূর পান পাতা দিয়ে বুক সেঁকে। নড়া নিয়ে দুজনের বুকে খোঁচা দেয় । সাতবার ঘোরার শেষে বরের মা দুজনের কপালে তিনবার করে বরণের থালাটি ছোঁওয়ায়। টুপা কপালে তিনবার ছুঁইয়ে ডান দিকে ফেলে দেয়।

এরপর লোহার বালা ও কাঁটা দেওয়া জলের ভাঁড় নিয়ে আসে । কাঁটার মধ্যে থেকে লোহার খাড়ু (বালা) বের করে বরের হাতে দেয় । বর সেটি বধূকে পরিয়ে দেয়। তখন সবাই 'হরি হরি বোল' বলে ।

তারপর বর-বধূকে হাত ধরে ঘরে বসায়। ননদ এসে বর- বধূর পা ধোওয়ায় । ননদরা বউয়ের ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুল ধরে থাকে । টাকা দিলে তারা ছেড়ে দেয়।

এরপর বর-বধূর 'ধান কাটা' লোকাচারের অনুষ্ঠান হয়। একটি নতুন মাদুরের ওপর কাঁসার থালা উপুড় করে রাখা হয়। বউয়ের মাথায় ছোট পাইয়ের মধ্যে ধান দেয় আর বর পেছনে জাঁতি দিয়ে নয় বার ধান ফেলতে থাকে আর বউ বাম পা দিয়ে কাঁসার থালাটা ঠেলতে থাকে।

সিঁদুরদান : বরের বাড়িতে সিঁদুর দান অনুষ্ঠান হয়। বধূ এরপর সিঁদুর দানের শাড়ি পরে বসে। বরের হাতের সোনার আংটি দিয়ে, সের দিয়ে,টাকাতে কনের সিঁথিতে সিঁদুর দান করে। সব শেষে হাতে সিঁদুর নিয়ে মাথায় ঘসে দেয়।
বধূ শ্বশুর বাড়িতে আসবার সময় 'ননদ পেটারি' সঙ্গে আনে। তাতে একদিনের চাল,ডাল, আলু, সব্জি,কাঁসার বাটি প্রভৃতি জিনিস থাকে। ছামড়া তলায় বর-বধূ দুজনকে মিষ্টি খেতে দেয়। বরের উচ্ছিষ্ট বধূকে খেতে হয়। কিন্তু বধূর উচ্ছিষ্ট বর খাবে না ।

মুখ দেখানি : যৌতুক না পেলে বউ মুখ দেখাবে না। পরিবারের লোকেরা পাড়ার রমণীরা এবং সবাই সোনা-রূপার গয়না ও টাকা-পয়সা দিয়ে নতুন বউয়ের মুখ দেখে ।

এরপর জামাইদাদা ছোটো গর্ত বা বাঁধ খোঁড়ে। টাকা না দিলে বাঁধ খুঁড়তে চায় না সে । সেই গর্তটিকে জলে পূর্ণ করা হয়। কনে শিলে বসে থাকে আর বর বসে কুচড়াতে। এরপর বর সেই জলের মধ্যে জাঁতি লুকিয়ে দেয়। আর কনে জাঁতিটি খুঁজে বরের হাতে দেয়। এরপর বধূ কাজললতা লুকায় বর সেটি খুঁজে বের করে কনের হাতে দেয়। এভাবে সাত বার খেলাটা হয় ।

কনের বাড়ি থেকে আনা গায়ে হলুদের আর মাছ-ভাত খাওয়ার এঁটো দুটি পাতা এবং বরের এঁটো পাতা ওই গর্তের মধ্যে ফেলে দিতে হয়। এঁটো পাতাগুলি দেওয়ার পর কনের বাড়ি থেকে আনা কলাগাছটি পুঁততে হয়। নয়জন মিলে গাছটি পুঁতবার সময় বলে –' বছর না ঘুরতে ঘুরতে ফল পাবি?' উত্তরে বলতে হয়-' হঁ পাব' । এভাবে তিনবার বলতে হয়। তারপর কনের হাতে বর তেল-হলুদ মাখিয়ে দেয় এবং কনে বরের গায়ে তেল-হলুদ মাখায়। জাঁতি, কাজললতা শাশুড়ির হাতে দিয়ে দেয় ।

সন্ধ্যে বেলায় ভাত, ডাল, তরকারি, মাছের মাথা দিয়ে 'ভাত-কাপড়' অনুষ্ঠান হয় । বর কনের হাতে থালা ধরিয়ে বলে 'আজ লে ভাত কাপড়ের দায়িত্ব আমার'। এভাবে তিনবার বলে।

বউভাতের পরের দিন বরের ঘরে বাঁদানি বসে। নতুন মাদুরের ওপর বর-বধূকে বসানো হয়। তাদের সামনে তিনটি কাঁসার থালা রাখা থাকে। একটিতে ধান-দূর্বা এবং প্রদীপ থাকে। বর-কনেকে ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করে যৌতুক দেয়। আশীর্বাদ শেষ হয়ে গেলে ধানগুলি মাদুরের ওপর রাখে। বর ঐ ধান দিয়ে পাইটা ভর্তি করে আর কনে তা খালি করে । আবার কনে ভর্তি করে বর খালি করে এভাবে সাতবার করতে হয়। বরের বাড়িতেও ছামানি ভাঁড় নাড়ানো খেলা হয় । প্রথমে বর ভাঁড়ের ঢাকনা খুলে ধান নেড়ে দেয় আর কনে ঢাকনা লাগিয়ে দেয়। আবার উল্টোভাবে কনে ঢাকনা খুলে ধান নাড়বে বর ঢাকনা লাগিয়ে যায় । তারপর বর-বধূর গাঁট বন্ধনের কাপড়টি নিয়ে ছামড়া তলায় সিধা ডাল ঢাকা অনুষ্ঠান হয়। বরের হাতে কাপড়টা ধরিয়ে দেয় বধূ তাতে টান দেয় আবার বধূ কাপড়টি ধরে থাকে বর সেটি টান দেয়- এভাবে তিনবার করতে হয়। বরের কপালের সিঁদুরের টিপ বধূর কপালে ছুঁইয়ে দেওয়ালে দুটি ফোঁটা দেয়। বড়দের প্রণাম করে ।

অষ্ট মঙ্গলায় বর-বধূ দুজনে মেয়ের বাপের বাড়িতে আসে। বউদি,ননদ বর-কনেকে বাঁধের ঘাটে নিয়ে যায়। এক ঘাটেই দুজনকে স্নান করতে হয়। জলে বর কাঁসার ঘটি লুকায় আর বধূকে খুঁজতে হয়। আবার উল্টো চিত্রও দেখা যায়। বধূ লুকাবে বর খুঁজবে।তিনবার করতে হবে। শ্যালিকাকে বধূর জামা কাপড় কাচতে হয়। পাওনা না দিলে জামাকাপড় কাচতে চায় না। পুকুর ঘাটে বর বউকে সাবান মাখায় আর বধূ বরের গায়ে সাবান মাখিয়ে দেয়। নতুন জামা কাপড় পরে। স্নান সেরে বটতলায়,মন্দিরে প্রণাম করে। গোরুকে প্রণাম করতে হয়। তারপর বাড়িতে ঢোকার আগে অর্ধেক রাস্তা থেকে বর-বধূ দুজনে ছোটো বাচ্চাকে কোলে করে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে। তাদেরকে মিষ্টি খেতে দেয়। এভাবে বাউরিদের বিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয় ।

বাউরিদের বিয়ের সময় যেসব গান গাওয়া হয় সেগুলো ক্ষেত্র সমীক্ষায় একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে কয়েকটি গান সংগ্রহ করেছি। এক্ষেত্রে বাউরিদের বয়স্ক বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের প্রচুর সহায়তা পেয়েছি। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদের গানগুলি তুলে ধরলাম।

বাউরি বিয়ের গান :

১) জোড় গাছটায় আয়না বসাব গো জোড় গাছটায় আয়না বসাব।
বিহাই ঘরের মেয়ালোককে টানে আনে নাচাব।

২) হাওয়াই গাড়ির তলে বিছানা ওই আমার শিশু জামাই
ঘুমাই গেলে উঠে না।

৩) কফি বাড়ির আগুড় খুলে দে
ও তদের জামাই আসছে ফটফটা গাড়িতে।

৪) জোড় গাছটায় আয়না বসাব
বিহাই ঘরের লোকগিলাকে টানে আনে নাচাব।

৫) কুলগাছটার ডগে দু আনি
ও তরা দেখে যা গো মেয়ের বাবার ফুটানি।

৬) সাহেব বাঁধের আড়ে যাতে কে ফুটাইল মোম ছাতা

পুরুলিয়া মফঃস্বল শিংবাজার গ্রামের চাঁদনি বাউরি (৩০), মণীষা বাউরি (৪০), ভাদি বাউরি (৬৫)'র কাছ থেকে সংগৃহীত। তারিখ : ২৮. ০৫.২০১৭।

সামাজিক রীতিনীতি : এদের সমাজে লোকায়ত জীবনে অজস্র সামাজিক রীতিনীতি চোখে পড়ে। যেমন-

১. জামাইকে নিমন্ত্রণ করতে হলে জামাই বাড়িতে গিয়ে এক ঘটি জলে সুপুরি ফেলে জামাইকে আসার জন্য নিমন্ত্রণ করতে হয়।বিয়েতে কাঁসা, পিতলের বাসনপত্র ইত্যাদি যৌতুক হিসাবে দিতে হয়। বিয়ে উপলক্ষ্যে বাউরি জাতির মধ্যে একই রকম জিনিসের আদান-প্রদান চলে। উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি সহজে বোঝা যাবে। যেমন – কারো মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে যদি কেউ ৫০ কেজি চাল দিয়ে সাহায্য করে তাহলে সাহায্যকারীর ছেলে বা মেয়ের বিয়ের সময় চাল সাহায্য পাবে। কেউ টাকা দিয়ে সাহায্য করলে তার ছেলে বা মেয়ের বিয়েতে টাকা দিয়ে থাকে।

২. বিবাহ-বিচ্ছেদ বাউরি সমাজে স্বীকৃত। বিবাহিত স্ত্রীর আঙ্গুলে পরিহিত লোহার আংটিটি স্বামীকে ফেরৎ দিয়ে দেয়। এই ঘটনাটি প্রামাণিক এবং পঞ্চায়েতকেও জানাতে হয়, তবেই বিবাহ-বিচ্ছেদটি কার্যকর হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মহিলারাও অত্যাচার, নিপীড়ন,দুর্ব্যবহারের জন্যও এদের সমাজের বিবাহিত মেয়েরা বিবাহ- বিচ্ছেদের পথ অবলম্বন করে।

৩. অন্য জাতির ছেলে বা মেয়ের সাথে বাউরিদের বিয়ে দেওয়ার নিয়ম নেই। যদি কেউ এই প্রথা ভাঙ্গে অর্থাৎ অন্য জাতির ছেলে বা মেয়েকে বিয়ে করে তবে তাদেরকে সমাজচ্যুত করা হয়। এমনকি সেই ছেলে বা মেয়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানও পালন করে। তাদেরকে বাউরি সমাজের লোকেরা ক্ষমাও করে না। মেনেও নেয় না।

৪. বাউরিদের সমাজে রয়েছে কঠোর অনুশাসন পদ্ধতি। একটা লোকপ্রবাদে তার প্রমাণ মেলে-

'কুকুর করল্য কাঁই কাঁই তো বাউরি বিহা নাই'।

বিয়ের পাকা কথা হয়ে থাকলেও তুচ্ছ কারণে বাউরি সমাজের লোকেরা সেই বিয়ে ভেঙ্গে দেয় বা বাতিল করে।

৫. রবিবার দিন বিয়ে করা বউ নিয়ে ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না। শাশুড়ির রবিবারে নববধূর মুখ দেখা নিষেধ। বধূকে অন্য কারো বাড়িতে বা মন্দিরে সারাদিন রেখে দেওয়া হয়। অন্ধকার হলে তবেই শ্বশুরবাড়িতে প্রবেশ করতে পারবে। আবার বধূ ঘরে এলেও শাশুড়ির বদলে অন্য নারীরা নিয়মগুলি পালন করবে।

৬. বাউরি জাতির লোক পুরোহিত হলে তাকে 'লাভা' বা দেঘরিয়া বলা হয়। গ্রামের প্রধানও পুরোহিত হতে পারেন।

৭. কুদ্‌রাসিনী দেবীর পূজার প্রাক্কালে বাউরি পুরোহিত মাছ-মাংস স্পর্শ করে না। পুজোর পর পাখি বা পশুর মাথা বা পা নিয়ে থাকে।

৮. বাড়ির কেউ মারা গেলে সেই বছর ওই বাড়িতে উঁধি (উনধি পিঠা) পিঠা হবে না। কেবল ছিল্কা পিঠা বানানো হয়।

৯. বাউরি সমাজের মধ্যে 'ফুল পাতানো'র রীতি দেখা যায়। দুটি পৃথক জাতির পৃথক পরিবারের ছেলেদের মধ্যে বা মেয়েদের মধ্যে ফুল পাতানো হয়। দুই ঘরের ছেলে বা মেয়েকে মন্দিরের সামনে নিয়ে গিয়ে 'ফুল পাতানো'র অনুষ্ঠান হয়। এই উপলক্ষ্যে সকলকে মিষ্টি মুখ করানো হয়।

১০. মকরের আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় নতুন শাড়ি পরে ঘরে ঘরে পিঠে বানানো হয়। একবার পিঠের হাঁড়ি উনুনে বসালে পিঠে বানানো শেষ না হলে তা নামাতে পারবে না।

সমাজ অনুশাসন পদ্ধতি : গ্রামাঞ্চলে বাউরি সমাজের সমাজপতির হাতে রয়েছে সমাজ অনুশাসনের দায়িত্ব। গ্রামের বাউরি সমাজের লোকদের নিয়ে গঠন করে 'ষোলআনা'। গ্রামে সভা ডেকে ষোলআনা বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে। বর্তমানে বাউরি সমাজ অনুশাসন পদ্ধতিকে বাস্তবায়িত করার জন্য গঠিত হয়েছে ' বাউরি সমাজ কল্যাণ সমিতি'। তারা নিয়মিত সভা ডাকে। সেখানে বাউরি জাতির বিভিন্ন মানুষ একসঙ্গে জড়ো হন। নানা সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা করে। সুবিধা-অসুবিধা আলোচনার মধ্য দিয়ে তারা বিভিন্ন উন্নয়নশীল কর্মসূচীর পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকেন। তবে বর্তমানে বিচারের আশায় পঞ্চায়েতে বা থানায় ছুটে যায়। পুলিশের সাহায্য নেয়। সেখানে বসেই নানা সমস্যার মীমাংসা করে।

টোটেম বা কুলচিহ্ন : কোনো জাতির প্রতীককে বলে কুলচিহ্ন বা টোটেম। কোনো পশু,পাখি বা প্রাণীর বৈশিষ্ট্যেরই সাথে যখন কোনো জাতির বৈশিষ্ট্যের হুবহু মিল থাকে তাকে টোটেম বলে।
বাউরিদের টোটেম হল কাশ-বক। বক যেমন শিকারী তেমনি বাউরি জাতিও শিকারী। সম্ভবত কাশ-বক থেকেই অপভ্রংশ হয়ে কাশ্যপ গোত্রটির উৎপত্তি হয়েছে।

ট্যাবু বা নিষেধাজ্ঞা : কাশ-বক তাদের কুলচিহ্ন। তাই তারা বক শিকার করে না। বাউরিরা কচ্ছপ খায় না।

লোকউৎসব : বাউরিদের প্রধান উৎসব ভাদু, টুসু। এরা মনসা ও ধর্ম ঠাকুরের পূজা করে। এছাড়া তারা শিব, কালী, শীতলা, ধর্ম ইত্যাদি দেব-দেবীর পূজা দেয়। সারা বছর জুড়ে কোনো না কোনো উৎসবে তারা মেতে থাকে। করম, রহিন, আখ্যান, বাঁদনা ইত্যাদি লোকউৎসবগুলিতে এরা নানা লোকাচার পালন করে থাকে।

ভাষা : বাউরি জাতির লোকেরা বাংলা ভাষায় কথা বলে। তবে রূপের দিক দিয়ে এই ভাষা 'মানভুঁইয়া বাংলা'। ভাষাবিদদের মতে এই ভাষা ঝাড়খণ্ডী উপভাষার অন্তর্গত।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারা : এদের সমাজের বেশিরভাগ লোকের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। পিছিয়ে পড়া জাতি বলে সমাজে শিক্ষার হার আশানুরূপ নয়। তবে ধীরে ধীরে এদের সমাজের ছেলে-মেয়ে উচ্চ শিক্ষায় আগ্রহী হয়ে উঠেছে। কেউ কেউ সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে। তারা সরকারের সাহায্য পাচ্ছে। এদের জন্য পাকাবাড়ি তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। দু টাকা কেজি দরে রেশনে চাল পাচ্ছে। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে পুরুষদের কাজ করার প্রতি অনীহা বেড়ে গেছে।

২. রাজোয়াড়

সংখ্যা গরিষ্ঠতার বিচারে বাউরি জাতির পরেই আছে রাজোয়াড় জাতির স্থান। ১৯৮১ সালে পুরুলিয়া জেলায় এদের সংখ্যা ছিল ২৭,১৯৩ জন। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী এদের সংখ্যা ৪৭,১৭৪ জন। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এঁরা হিন্দু সমাজে 'অসৎ শূদ্র' নামে পরিচিত। এরা সমাজে অস্পৃশ্য জাতি বলে বিবেচিত।

নৃতাত্ত্বিক পরিচয় : আদিম মানব গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত রাজোয়াড় জাতি । নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে এরা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্গত। কুর্মি ও কোল সম্প্রদায়ের মিশ্রণে এদের উৎপত্তি ঘটেছে । সম্ভবত এরা নাগপুর থেকে পুরুলিয়ায় এসেছিল । ধানবাদের ভুঁইয়াদের সাথে এদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। পুরুলিয়ার বিভিন্ন গ্রামে এরা ছড়িয়ে পড়ে । দেউলভিট্যা, শিংবাজার, নূতনডি, জালিকা, সুরুলিয়া ইত্যাদি গ্রামে রাজোয়াড় জাতির মানুষের বসবাস সর্বাধিক চোখে পড়ে ।

চেহারার বৈচিত্র্য : রাজোয়াড় জাতিটি যেহেতু দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্গত তাই এদের উচ্চতা মাঝারি ধরনের। মাথা লম্বা,পাতলা গড়ন,নাক ছোটো, গায়ের রং কালো ।

সামাজিক বিন্যাস : এদের সামাজিক বিন্যাসের মধ্যে রয়েছে উপসম্প্রদায়,গোত্র ও পদবি প্রসঙ্গ। যথা-

ক.উপসম্প্রদায় : রাজোয়াড় জাতির অন্তর্গত সাতটি উপবিভাগ রয়েছে। অঙ্গরোক/ অঙ্গওয়ার, ছাপওয়ার, সিখারিয়া, সুকুলকারা, বার-গোহরি, মাঝহল-তুরিয়া, বেরা-রাজোয়াড় । এদের মধ্যে বারগোহরি, মাঝহল-তুরিয়া, বেরা-রাজোয়াড় দের লোহারদাগায় দেখা যায়। সিখারিয়াদের দামোদর এবং বরাকর নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে, পরেশনাথ পাহাড়ের পূর্বদিকের এলাকায় দেখতে পাওয়া যেত।

খ. গোত্র : রাজোয়াড়দের গোত্র হল শাণ্ডিল্য, নাগ, সিংহ প্রভৃতি ।

গ. পদবি : রাজোয়াড় জাতির মানুষেরা রাজোয়াড়,কপটদার,রায় ইত্যাদি পদবি ব্যবহার করে।

বাসস্থান : গ্রামের মধ্যে রাজোয়াড় জাতির মানুষেরা পাশাপাশি বসবাস করে। তাদের বাড়িগুলি মাটির তৈরি। ঘরের চালাগুলো খাপরা,টালি,খড় দিয়ে ছাওয়া।কেউ কেউ ঘরের চালায় টিন ও অ্যাডবেস্টাসের ছাউনি দিয়েছে। বর্তমানে তাদের জন্য সরকারি সহায়তায় পাকা বাড়ি নির্মিত হচ্ছে। এদের ঘরগুলোর উচ্চতা খুব বেশি থাকে না। ঘরের দরজা হয় মাঝারি মাপের । একটু মাথা নুইয়ে ঘরে ঢুকতে হয়। অন্য ঘরগুলিতে যেতে হলে দরজা পেরিয়ে পেরিয়ে যেতে হয়। আর থাকে পায়রার খোপের মতো দেখতে ছোট একটি জানালা। বাঁশের পাটা দিয়ে আটকানো। শেষের ঘরটি ভাঁড়ার ঘর। তাতে ধান, চাল, ডাল, কাঠ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মজুত করে রাখে । তার আগের ঘরটি রান্নাঘর। পুকুর বা নলকূপ থেকে জল আনার জন্য বা বাইরে মেয়েদের যাওয়া আসার জন্য ঘরের খিড়কি দুয়ার থাকে। এতে লোকজনের সামনা সামনি যাতে তাদের পড়তে না হয়। কেননা এরা ভদ্র শিক্ষিত মানুষের সংস্পর্শে আসতে চায় না ।

ঘরের সামনে দাওয়া থাকে। সেখানে বসে বয়স্করা গল্প করে । উঠোনের এক দিকে থাকে তুলসীমঞ্চ। আর একদিকে থাকে গোরু-বাছুর রাখার গোয়ালঘর।

খাদ্যাভ্যাস : রাজোয়াড়রা ভাত ও রুটি খেতে ভালোবাসে। ভাতের সাথে তারা শাক-সব্জি,মাছ-মাংস,ডিম ইত্যাদি খায়। অর্থাৎ তারা আমিষ ভোজন করে। পাখির মাংস খেতে এরা বেশি পছন্দ করে। এছাড়াও এরা চিঁড়া,মুড়ি,ছাতু ইত্যাদি খাবার খায় ।

সারাদিন পরিশ্রমের পর রাজোয়াড়দের কেউ কেউ মদ,গাঁজা, ভাঙ ইত্যাদি নেশাজাতীয় দ্রব্য খায় ।

ব্যবহারিক সামগ্রী : রাজোয়াড়দের দৈনন্দিনের ব্যবহারিক সামগ্রী অত্যন্ত সাদাসিধে প্রকৃতির । দিন বদলের সাথে সাথে মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জিনিসপত্রেরও বদল ঘটেছে । আগে ছিল পাথর, লোহার তৈরি ভারী ভারী বাসনপত্র। তারপর কাঁসা-পিতলের বাসনপত্রের চলন হল । এল মাটির তৈরি বাসনপত্র। কিন্তু সেগুলি টেকসই নয় । তাই হাল্কা ও টেকসই জিনিস ব্যবহারের দিকে মানুষের ঝোঁক বাড়ল । তারা রান্নার জন্য বেছে নিল- অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি, কড়াই,গামলা ইত্যাদি। আর খাবারের জন্য ব্যবহার করে স্টিলের থালা, বাটি, গ্লাস, ঘটি ইত্যাদি বাসনপত্র । বাঁশ ও বেতের ঝুড়ি, কুলো, টুপা, ডালা ইত্যাদি সামগ্রীও দৈনন্দিন জীবনে তারা ব্যবহার করে থাকে ।

চাষ করবার যন্ত্রপাতি লাঙল, কোদাল, কাস্তে, খুরপি ইত্যাদি ব্যবহার করে ।

সাজ-পোশাক : গ্রামের মেয়েরা সুতির ছাপা রঙিন শাড়ি পরে । ছোট ছোট মেয়েরা পরে ফ্রক ও চুড়িদার । যুবতীরা শালওয়ার, চুড়িদার, কুর্তি, স্কার্ট পরতে ভালোবাসে। বয়স্ক পুরুষরা লুঙ্গি, ধুতি পরে । যুবকরা পরে প্যান্ট, শার্ট, গেঞ্জি, জিনসের মতো আধুনিক পোশাক-আশাক ।

প্রসাধন সামগ্রী : রাজোয়াড় ছেলে-মেয়ে মাথায় সুগন্ধি তেল,সাবান ,শ্যাম্পু ব্যবহার করে। মুখে মাখে স্নো-পাউডার। চোখে কাজল, ঠোঁটে লিপস্টিক, চুলে ক্লীপ ইত্যাদি নানা প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করে মেয়েরা নিজেদের সুন্দর করে তোলে।

অলংকার : রাজোয়াড় সমাজের মেয়েরা সোনা ও রূপার ভারী গয়না পরতে ভালবাসে। তবে এদের সমাজের নারীমহলে রূপোর অলংকারের চলন বেশি । রূপোর দিকে এদের ঝোঁক বেশি হলেও বর্তমানে মেয়েরা ইমিটিশানের গয়না পরে। রং বেরঙের কাঁচের চুড়ি হাতে পরে।

জীবিকা : রাজোয়াড়দের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। এদের মধ্যে কেউ কেউ রায়ত স্বত্ব ভোগ করে। বেশিরভাগ লোকদের অবস্থা ভূমিহীন । তাই এরা চাষীর ঘরে দিন মজুরের কাজ করে । তবে বর্তমানে জীবিকার পরিবর্তন করেছে। উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে এদের ছেলে-মেয়েরা বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে কর্মরত।

ধর্ম : রাজোয়াড়রা হিন্দু ধর্মাবলম্বী। তবে এরা নিজেদের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে দাবি করে।

দেব-দেবী : রাজোয়াড় জাতির লোকেরা শিব, মনসা,বিষাই চণ্ডী,বাঘুৎ ঠাকুর, গরাম ঠাকুর ইত্যাদি দেব-দেবীর পূজা করে। এছাড়া ভাদু,টুসু,ভান সিং প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজার সময় লোকমেলার আয়োজন করে । রাজোয়াড় পরিবারের লায়া (পূজারী) গো বাথান পূজা করে।

লোকবিশ্বাস : রাজোয়াড় সমাজের লোকেদের মধ্যেও কিছু লোক বিশ্বাস রয়েছে। যেমন- ডাইনি লাগা , হাওয়া লাগা, নিশি পাওয়া প্রভৃতি। এরা ভূত-প্রেতে এখনও বিশ্বাস করে থাকে । এছাড়াও রয়েছে আরও অজস্র লোকবিশ্বাস । যেমন-

১. সন্তান জন্মের সাত-নয় দিন পর স্নান করিয়ে যখন তাঁকে তেলের সেঁক দেওয়া হয় , তখন দা দিয়ে তার পেটে তেলের ৬টি বিন্দু গোল করে আঁকা হয়। রাজোয়াড়দের বিশ্বাস এতে শিশুর কলেরা ও পেটের রোগ হয় না।

২.ছাদ্না তলায় বিয়ের আগে বর এবং কনেকে সোনা-পিতল দেয়। কনেকে সোনা দিলে বংশ সোনার মতো সমৃদ্ধ হয়। বংশে পুত্রসন্তান হয়।

৩. অম্বুবাচীর সময় আমে-দুধে খেলে মঙ্গল হয়। ঐ সময় মাটি খুঁড়লে শূকর হয়।

৪. জিতবাহন বা জিতা পূজার প্রদীপের শিখাটি রাজোয়াড়রা দেখে না। কোনো এক সময় তাদের পূর্ব পুরুষরা ৬ মাসের শিশুকে ঘরে শুইয়ে জিতা পূজা করতে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে একটা বাঘ শিশু নিয়ে বসে আছে। তখন থেকেই বাঘ-ভূতের পূজা করে তারা।

৫. রাজোয়াড়রা আরও বিশ্বাস করে যে ঘরের চৌকাঠ বসু মাতার গলা,তাই চৌকাঠে বসতে নেই।

লোকসংস্কার : রাজোয়াড় সমাজে বেশ কিছু লোকসংস্কার প্রত্যক্ষ করেছি। যেমন-

ক. জন্ম-সংস্কার : এদের সমাজে শিশুর জন্মগ্রহণ করার পর এরা কিছু সংস্কার মেনে চলে। সেগুলি হল-

১. শিশু জন্মানোর পর দুদিন প্রসূতিকে জল,খাবার কিছুই দেওয়া হয় না। তৃতীয় দিনে তাঁকে শুধু গরম জল দেওয়া হয়। চার দিনের দিন তাঁকে খাবার খেতে দেওয়া হয়। শিশুর জন্মের পর থেকে পাঁচ দিন ধরে শিশুর মাকে বিশেষ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে খাবার দেওয়া হয়।

২. ছয় দিনের দিন অশৌচ এবং নয় দিনে 'লরাত' পালন করতে হয়। লরাতের সময় মা এবং শিশুকে তেল মাখিয়ে স্নান করানো হয়।

৩. একুশ দিনের দিন 'একুশা' অনুষ্ঠান পালন করা হয়। মেয়ের বাবা মেয়েকে নতুন জামা কাপড় এবং চাল দেয়।

৪. মুখে ভাতের সময় শিশুটি মামা বাড়ির ভাত খায়। মামাবাড়ি থেকে শিশুটিকে হাতে বালা, রূপার গোট, গলায় চেন দেয়।

৫. কারো মানত থাকলে তাকে ষষ্ঠীপূজা করতে হয়।

খ. বিবাহ-সংস্কার : এদের সমাজে বিবাহের নিম্নলিখিত সংস্কারগুলি চোখে পড়ে-

১. রাজোয়াড়দের সমাজে প্রাপ্ত বয়স্ক হলে যুবক-যুবতীদের বিবাহ হয়। রাজোয়াড়দের সমাজে আগে বাল্যবিবাহ ছিল। তবে বর্তমানে নেই।

২. তবে এদের মধ্যে বহু বিবাহের প্রথা রয়ে গেছে। একজন পুরুষ যতজন নারীর ভরণ পোষণ করতে পারবে ততজনকে বিয়ে করতে পারবে।

৩. একজন বিধবা দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারে। রাজোয়াড়দের মধ্যেও এটি 'সাঙ্গা প্রথা ' নামে প্রচলিত। সে তার মৃত স্বামীর ছোট ভাইকে বিবাহ করতে বাধ্য নয়। নিঃসন্তান বিধবারা পুনরায় বিবাহ করতে পারে।

৪. ঘটকের মধ্যস্থতায় পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করা হয়। বিবাহে কনে পণ নেওয়া রীতি রয়েছে।

৫. আশীর্বাদের দিন পাত্রপক্ষ কনের বাড়িতে এসে উপস্থিত হলে কনের বাবা,জ্যাঠা ঘটিতে আমপাতা দিয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানায়। তাদের তুলসী মঞ্চের কাছে বসানো হয়। কনেকে নিজেদের বস্ত্র পরিয়ে পাত্রপক্ষের সামনে হাজির করে। একটি থালায় হলুদ,সুপারি,ধান,দূর্বা,শাড়ি,গহনা,প্রসাধন সামগ্রী দিয়ে কনেকে আশীর্বাদ করে। ছেলেদের ক্ষেত্রেও পাত্রকে ধুতি,পাঞ্জাবি,তোয়ালে,আংটি দিয়ে আশীর্বাদ করা হয়।

৬. এরপর বরের বাড়ি থেকে কনের বাড়ির লোক (কাকা, দাদা, মামা) লগন ভাঁড়, মিষ্টি বা লাড্ডু, সিঁদুর, ধান, কাজললতা, হলুদ রঙের শাড়ি ইত্যাদি দ্রব্য নিয়ে কনের বাড়িতে আসে।

৭. লগন ভাঁড় আনার পর আইবুড়ো ভাত বর ও কনেকে নিজের নিজের বাড়িতে খাওয়ানো হয়।এটি করা হয় বিয়ের দু-তিন দিন আগে।

৮. এরপর খই খাজাড়ি,গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান হয়। বর এবং কনেকে আকন্দ ফুলের মালা পরানো হয়। গায়ে হলুদের পর মেয়ে ঘর থেকে আর বেরোতে পারে না।

৯. বিয়ের পর সন্ধ্যাবেলায় স্নান করতে যাবার আগে নিয়ম আছে তীর-ধনুক চালানো। কোনো কিছু জিনিস দিয়ে তীর ধনুক চালাবার মতো ছেলেটা ভঙ্গী করে তখন কনে তার বরকে জিজ্ঞাসা করে 'কি নিয়ে এলে ? এটা কি মেরেছ ?' তখন বরকে তিনবার উত্তর দিতে হয়।

গ. মৃত্যু-সংস্কার : এদের সমাজে মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিবিধ সংস্কার-বিশ্বাস লোকসমাজে ছড়িয়ে রয়েছে।

১. রাজোয়াড়দের কেউ মারা গেলে শবদেহ দাহ করে। মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় দোপথের রাস্তা পেলে মৃতদেহের মাথা ঘুরিয়ে নিতে হয়।

২. মুখাগ্নি করার সময় পলাশ কাঠ লাগে। দাহ করার পর এক টুকরো অস্থি ভাঁড়ে করে গোয়াল ঘরের কোণে রেখে দেওয়া হয়। পরে সেটিকে গঙ্গা বা দামোদর নদে বিসর্জন দেওয়া হয়।

৩. মুখাগ্নিকারী ব্যক্তি তিন দিনে এবং নয়-দশ দিনে হবিষ্যান্ন রান্না করে। মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে হবিষ্যান্নের কিছুটা উৎসর্গ করতে হয়। পশু-পাখি ডেকে দিলে হবিষ্যিান্ন আর খাওয়া যায় না।

৪. শ্মশানযাত্রীদের তিন দিনে 'তিতা ভাত' খাওয়াতে হয়।

৫. তিন দিনের পর থেকে তেল মাখতে নেই।

৬. কেউ দশ দিনে, আবার কেউ বারো দিনে ঘাট শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান পালন করে।

বিবাহরীতি : বিয়ের দিন ছাদ্‌নাতলা তৈরি করা হয়। বরের মা, কাকিমা, বউদি, দিদি,জামাইবাবু,ছোট ছোট বাচ্চারা সবাই মিলে নাচ-গান করতে করতে পুকুর ঘাটে যায়। বরের মায়ের হাতে থাকে একটি থালা। তাতে ডিম, ধূপ, খড়ি মাটি, ধান, আতপ চাল, দূর্বা ঘাস, প্রদীপ প্রভৃতি দ্রব্য দিয়ে সাজানো থাকে। বাঁধের ঘাটে গিয়ে বরের মা জলসাওয়া

দুটো হাড়িকে ঘাটের সামনে উপুড় করে রাখে। তারপর হাড়ির সামনে দুটো ছোট বালির স্তূপ করে তাতে খড়ি মাটির আলপনা দেয়। একটি ডিম বসায়। ডিমের গায়ে খড়ি মাটির দাগ দেয়। তারপর ধান,আতপ চাল, দূর্বা ঘাস দিয়ে হাঁড়ি দুটোকে পূজা করে।। বালি সমেত ডিমটিকে হাতে করে নিয়ে গিয়ে জলে ধুয়ে নেয়। জামাইদাদা কাস্তে দিয়ে জল কাটে। দুটি হাঁড়িতে মেয়েরা জল ভরে গায়ে নতুন শাড়ি ঢাকা নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসে।

ছাদ্না তলায় বরের মায়ের আঁচলে বয়স্ক মহিলা চাল দেয়। বরের মা তিন ভাগে চাল মাটিতে রাখেন। তারপর জল ভর্তি হাঁড়িগুলো দূর্বাঘাস,ধান দিয়ে তিনবার পূজা করেন। হাঁড়ির গায়ে খড়ি মাটি, সিঁদুরের দাগ দেওয়া হয়। ছাদ্না তলায় হাঁড়ি নিয়ে তিন বার ঘুরে দুই ভাগ চালের ওপর হাঁড়ি দুটিকে বসায়। হাঁড়ি দুটির মধ্যে আমডাল, প্যাকাটি ঢুকিয়ে রাখে।

এরপর ছাদ্না তলায় মেয়েরা আলপনা দেয়। ঘরের ভেতর থেকে একটি খাঁচি তিন জনে মিলে ধরে ধরে নিয়ে আসে। খাঁচিতে আর্ধেক চাল ভরে তার ওপর একটি হাঁড়ি রাখা থাকে। হাঁড়ির ওপর জ্বলন্ত প্রদীপ বসানো থাকে। ছাদ্না তলায় তিনবার ওই খাঁচিটিকে নিয়ে ঘোরে। যারা ঘোরাতে থাকে তাদের পিঠে মেয়েরা কিল মারে। তিন বার ঘোরা হয়ে গেলে বাকি এক ভাগ চালের ওপর খাঁচিটি বসানো হয়।

বাড়ির মেয়েরা বরের অষ্টাঙ্গে ছোট একটি নোড়া ছোঁয়ায়। তারপর তাকে তেল মাখায়। মাথায় একটা শালপাতা উল্টো করে ঢাকা দিয়ে দেয়। তার ওপর জলসাওয়া হাঁড়ির জল ছিটিয়ে দেয়। এরপর তুলসী তলায় হাল জোয়ালকে পূজা করে। হালের গায়ে খড়িমাটির দাগ, সিঁদুরের ফোঁটা দেয়। ঘটির জল তিনবার ঢেলে প্রণাম করে।

এরপর বরকে ছাদ্না তলায় নিয়ে আসা হয়। বরকে বসিয়ে তার মাথার উপর ধুতি বা শাড়িকে টান টান করে ধরে রাখে। বরের বাবা প্রথম বরের পায়ে আলতা পরান। একটি শালপাতায় চাল নিয়ে আসে। সেই চাল বরের হাতে দেন সেই সময় বরের চোখ অন্য কেউ পেছন দিক দিয়ে চাপা দিয়ে রাখে, যাতে বর দেখতে না পায়। বর তার হাতের চালকে তিনবার মেপে থালায় রেখে দেয়।

বর তার বেশভূষা বদলে নেয়। ধুতি, পাঞ্জাবি পরে মাথায় টোপর দিয়ে ,কপালে চন্দনের ফোঁটা লাগিয়ে বরের বেশে ছাদ্না তলায় হাজির হয়। ছাদ্না তলায় আম ডাল বাঁধা লাঠিতে খড়িমাটির দাগ দেয়। লাটাইয়ের সুতো নিয়ে হাতে শীতল বেঁধে দেয়। আমগাছের সাথে ছেলেটির বিয়ে দেওয়া হয়।

বর ও বরযাত্রীরা কনের বাড়ির দিকে রওনা দেয়। সেখানে বর এবং কনে পক্ষের লোকেরা একে অপরকে মালা পরিয়ে অভ্যর্থনা জানায়। বরের মাথায় জলের হাঁড়িতে আমপাতা চুবিয়ে জল ছেটানো হয়। কনের মা, কাকিমা,মাসিমা সবাই এসে পান দিয়ে বরের গাল সেঁকেন, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দেন। আতপ চাল,ধান-দূর্বা দিয়ে বরণ করেন। মিষ্টি, জল খাওয়ান। কনের জামাইবাবু বা দাদা বরের হাত ধরে ঘরে নিয়ে আসে। তারপর বসতে দেয়।

এরপর কনের বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হয়। খাঁচি ভর্তি চাল ছাদ্না তলায় নিয়ে আসে। নতুন মাদুর পাতা হয়। কনের হাত ধরে কনের মা তাকে ছাদ্না তলায় আনে। হাতে জল নিয়ে ঢালতে ঢালতে তিনবার মাদুরের চারদিকে ঘোরায়। মাদুরের ওপর কনেকে বসানো হয়। কনের মাথায় একটি নতুন কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখে। নোড়া দিয়ে বাড়ির

মেয়েরা আট অঙ্গে ছোঁওয়ায়। বাবা মেয়ের পায়ে আলতা পরিয়ে দেন । কনের হাতে শীতল বাঁধে। বরের মতোই কনে্র সাথে মহুল গাছের বিয়ে হয়। বাড়ির মা,কাকি, জেঠিমা সবাই কনের আল্ল খান ।

বরের মাথায় পাগড়ি বেঁধে মাথায় আম পাতা গোঁজে। আর কনের দাদা বা জামাইবাবু মাথায় গামছা বা কাপড় বেঁধে আমপাতা গুঁজে প্রথমে একে অপরকে মিষ্টি খাওয়ায়। তারপর দুজনের হাতে পানের খিলি ধরিয়ে দেয়। জামাইবাবু বরকে হাতে ধরে তিনবার ঘোরায়। বর ও কনের দাদা বা জামাইবাবু একে অপরের পান তিনবার বদল করে। সেই পান একে অপরকে খাওয়ায়।

বর ও কনে নতুন মাদুরের ওপর বসে। কনের বাবা নোওয়া প্রদীপে সেঁকে এবং কনের কপালে ছুঁইয়ে থালায় রেখে দেয়। এরপর একটা বাচা ডালি বর ও কনের মাঝখানে বসানো হয়। একটি কাপড় দিয়ে বর ও কনের মাঝখানে পর্দার মতো করে আড়াল করা হয়। বাচা ডালির মধ্যে চারটি পানের ওপর সুপুরি দেওয়া থাকে। বর সেই পান গুলোর ওপর সিঁদুর অল্প অল্প করে দেয়। তারপর কনে সেই পান থেকে অল্প সিঁদুর তুলে পাশে রেখে দেয়। বর ও কনে একে অপরের মালা গলা থেকে খুলে হাতে নেয়। কাপড়ের তলা দিয়ে হাতে হাতে মালা বদল করে তিনবারের বেলায় একে অপরকে মালা পরিয়ে দেয় ।

এরপর হয় 'সিঁদুর দান' অনুষ্ঠান। বর আঙুলে সিঁদুর নিয়ে কনের কপালে ঠেকিয়ে সিঁথি পর্যন্ত টেনে দেয়। সবাই 'হরিবোল' বলে ওঠে। তিনবার সিঁথিতে ঠেকিয়ে পাতার পুরো সিঁদুর সিঁথিতে দিয়ে দেয়। এরপর উভয়ের গাঁটছড়া বেঁধে দেওয়ার রীতি চোখে পড়ে । বর-কনেকে মিষ্টি জল খাওয়ায় । শ্যালিকারা এসে জামাইবাবুর ও দিদির পা ধুইয়ে দেয় । পাওনা চায় । এরপর ছাদ্নাতলায় বাঁদানির অনুষ্ঠান বসে। বর ও কনের সামনে দুটি থালায় ধান,দূর্বা রাখা থাকে। পাড়া প্রতিবেশীরা বর,কনেকে ধান,দূর্বা ও টাকা পয়সা দিয়ে আশীর্বাদ করে।

বিয়ের পর কনে বিদায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। কাকিমা,মাসিমা ও অন্যান্য মেয়েরা কনের হাতে চাল দেয়। বর , কনেকে পেছন থেকে ধরে থাকে। কনে পেছনের দিকে চাল মায়ের আঁচলে ফেলে ঘর পূরণ করে । বর-কনেকে মিষ্টি , জল খাইয়ে কনে বিদায় দেয়।

গ্রামে এসে মন্দিরে প্রণাম করে বর বাড়ির দরজায় দাঁড়ায়। ঘটিতে জল নিয়ে আমপাতা দিয়ে জলের ছিটা দেয়। বর-কনেকে ছাদ্না তলায় বসায়। বাড়ির ও প্রতিবেশী মেয়েরা পান পাতা দিয়ে নতুন বউয়ের গাল সেঁকে । নোয়া প্রদীপে সেঁকে বউয়ের হাতে পরিয়ে দেয়। যে যার সাধ্যমতো টাকা ও গয়না ইত্যাদি উপহার দেয়। ননদ বউয়ের বুড়ো আঙুল (খাঁখড়ি)ধরে থাকে। পাওনা চেয়ে বসে । পয়সা দিলে ছেড়ে দেয়। সন্ধ্যাবেলায় প্রীতিভোজের অনুষ্ঠান হয় ।

সামাজিক রীতিনীতি : এদের সমাজে অনেক সামাজিক রীতিনীতি রয়েছে । যথা-

১. সমাজে রাজোয়াড় অস্পৃশ্য জাতি। অবস্থান খুব নিচে। ব্রাহ্মণরা এদের ছোঁওয়া জল খায় না। হিন্দু সমাজে ' জলচল' নয় বলে ব্রাহ্মণরা এদের পূজাপাঠ যজন যাজন করে না, তাই এদের নিজস্ব পুরোহিত রয়েছেন। যে সব ব্রাহ্মণ পূজা অর্চনা করে এবং যে সব বৈষ্ণব কঠোর জীবনব্রত পালন করে তারা এদের আধ্যাত্মিক পথে চালিত করে। তারা এদের বাড়িতে মিষ্টান্ন পাক্কি খাবার ভোজন করে। ব্রাহ্মণরা যাদের হাত থেকে জল নিয়ে পান করে তাদের থেকে নিজেদেরকে আলাদা ভাবে।

২. কুর্মিরা সবচেয়ে নিচু স্তরের। এদের কাছ থেকে রান্না করা খাবার রাজোয়াড় গ্রহণ করে।

৩. বিবাহের দিন গানের আসরে বর ও কনে পক্ষ গানে গানে হাসি-ঠাট্টার মধ্য দিয়ে একে অপরকে গালিগালাজ করে থাকে।

৪. আষাঢ় মাসে কনের বাড়ি থেকে নব দম্পতিকে নিমন্ত্রণ করা হয়। এদের আষাঢ়ী অনুষ্ঠান রয়েছে। এই অনুষ্ঠানে ছাতা, গামছা দেওয়া হয়।

৫. রাজোয়াড়দের বিয়েতে একে অপরকে পান খাইয়ে নিজেদের সম্পর্কের বন্ধনকে অটুট রাখে।

সমাজ অনুশাসন পদ্ধতি : গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সমাজ অনুশাসনের দায়িত্বে থাকে। রাজোয়াড় জাতির সুবিধা-অসুবিধা বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণ করার জন্য রাজোয়াড় সমিতি রয়েছে। এছাড়াও গ্রামের 'ষোল আনা' কমিটি নানা সমস্যার মীমাংসা করে থাকে।

লোক উৎসব : শিবের গাজন ,মনসা, ভাদু ,টুসু পরব, ইঁদ, আখ্যান, বাঁদনা, জাওয়া, করম,তিজ,ডাল পূজা ইত্যাদি উৎসব –পার্বণে রাজোয়াড় জাতির আবালবৃদ্ধবণিতা আনন্দে মেতে ওঠে।

ভাষা : রাজোয়াড়দের আসল ভাষা হল **'**মানভুঁইয়া' বাংলা। কেউ কেউ 'খোট্টা ভাষায়' কথা বলে। তবে শিক্ষার আলোয় এদের ভাষার কিছু পরিবর্তন ঘটছে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারা : এরা অন্ত্যজ সম্প্রদায়। রাজোয়াড়দের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নয়। দুঃখ,কষ্ট,দারিদ্রের মধ্য দিয়ে তাদের দিন কাটে। এরা দিন আনে দিন খায়। গ্রামাঞ্চলে নারী-পুরুষরা ক্ষেত-খামারে মুনিষের কাজ করে যা পায় তাতেই তাদের সংসার চলে। কেউ কেউ ইঁটভাটায় শ্রমিকের কাজ করে। গ্রামে কাজের সুযোগ না থাকলে তাদের কেউ কেউ শহরে গিয়ে মুটে মজুরের কাজ করে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে। পুরুষরা মজুরের কাজ এবং মেয়েরা কামিনের কাজ করে কিছুটা আর্থিক স্বচ্ছলতা এনে দেয়। তবে বর্তমানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় তাদের জীবনের মানোন্নয়ন ঘটেছে।

৩. ডোম

ডোম জাতি যে কত প্রাচীন তার প্রমাণ মেলে প্রাচীন বাংলার অন্যতম নিদর্শন 'চর্যাপদ' গ্রন্থে। উক্ত গ্রন্থের ১০ নং, ১৪ নং ও ১৯ নং পদে ডোম জাতির প্রসঙ্গ রয়েছে।

১. **'**নগর বারিহিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাই সো বাহ্ম নাড়িআ।।' ('চর্যাগীতিকোষ',নীলরতন সেন,পৃ.-৩১)

২. ' বাহ তু ডোম্বী বাহ লো ডোম্বী বাটত ভইলা উছারা।।'(তদেব,পৃ.- ৪৩)

৩. 'জঅ জঅ দুংদুহি সাদূ উছলিআ।
কাহ্ন ডোম্বী বিবাহে চলিআ।।'(তদেব,পৃ.- ৫৭)

ডোম্বিপাদ নামক বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যের নামও জানা যায়।

নৃতাত্ত্বিক পরিচয় : নৃতাত্ত্বিকদের মতে ডোম জাতিটি দ্রাবিড় গোষ্ঠী থেকে উদ্ভুত। এরা পর্বতীয় অনার্য জাতি বিশেষ। এরা সম্ভবত ডোমার, ডম্বু , ডোম্বো নামেও পরিচিত। উপজাতি-উদ্ভুত জাতি।

লোকগবেষকদের মতে এরা আর্য জাতির শাখা। উত্তর ভারতের অধিবাসী বলেও অনেকের ধারণা। তবে সাধারণভাবে বলা যায় এরা ভারতের আদিম মানব গোষ্ঠীর অন্তর্গত। বাইরের লোকের কাছে এরা ' চণ্ডাল' বলে পরিচিত। বিহারে এদের ভাঙ্গি বলা হয়।

ড. অতুল সুর তাঁর 'বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ' অনুসারে পিতা - লেট ও মাতা- চণ্ডাল দুইজনের মিশ্রণে ডোম জাতির উৎপত্তি।[৩]

চেহারার বৈচিত্র্য : এদের মাথা লম্বা, উচ্চতা মাঝারি, নাক ছোটো , গায়ের রং কালো। এরা কর্মঠ প্রকৃতির।

সামাজিক বিন্যাস : এদের সামজিক বিন্যাসে এদের উপসম্প্রদায়,গোত্র ও পদবি সম্পর্কে জানা যায়।

ক. উপসম্প্রদায় : এক বড় জাতিগোষ্ঠী হল ডোম সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের আঠারটি উপসম্প্রদায় রয়েছে। সেগুলি হল- ১) আঙ্কুরিয়া ২) বিসডেলিয়া ৩) বাজুনিয়া ৪) মাগাহিয়া ৫) সাঁচি ৬) তালাইবনা ৭) আটুরা ৮) মন্দারণা ৯) মুর্দাফরাস ১০) বানুকিয়া ১১) শিখরিয়া ১২) কাউরা ১৩) কালিন্দী ১৪) মোলা ১৫) ধাকালধেসিয়া ১৬) ধাই ডোম ১৭) ঘসেরা ১৮) ধোলা। এদের পরিচিতি হল-

১.'আঙ্কুরিয়া' কথাটি এসেছে 'অঙ্কুশ' (হুক) শব্দ থেকে।

২.'বাজুনিয়া'-বাদ্যকর ডোমদের বাজুনিয়া বলা হয়।

৩.'বাঁশফোড়'- বাঁশ চেরাই করে ঝুড়ি-চুবড়ি বানায়।

৪.'ছাপারিয়া'- বাঁশের কাঠামো বানায় যা দিয়ে ছাদ (ছাপার) তৈরি করা যায়।

৫.'মাগাহিয়া'- জমি চাষ করে ,বাঁশ দিয়ে মাদুর,ঝুড়ি বানায়।

৬.'দাই'- ধাইমায়ের মতো কাজ করে।

৭.'তাপসপুরিয়া' বা 'ধাকাল ধেসিয়া' ডোম সম্প্রদায় শবদেহ বহন করে।

বাদ্যকর সবার উচ্চে অবস্থান, কালিন্দী তার নিচে এবং সবার নীচে টুরি ডোম রয়েছে।

খ. গোত্র : ডোম জাতির তেরোটি গোত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। যথা- ১) অজঘলা,২) কছুয়া,৩) করওয়া,৪) ক্যারকেটা,৫) হড়বনাস,৬) ধুসিয়া,৭) মহুয়া,৮) মুশ,৯) নাগ,১০) শোল,১১) তিরকি,১২) রওত,১৩) সন্ধ। এছাড়াও রয়েছে শাণ্ডিল্য গোত্র।

গ. পদবি : ডোম জাতির মানুষ ডোম, বাদ্যকর, কালিন্দী, রাম ইত্যাদি পদবি ব্যবহার করে।

বাসস্থান : অস্পৃশ্য জাতি বলে ডোম জাতির লোকেরা নগরের বাইরে বসবাস করতো। 'চর্যাপদ'গ্রন্থে এর প্রমাণ রয়েছে। পুরুলিয়ার গ্রামাঞ্চলে ডোম জাতির অধিকাংশ মানুষ তাদের বসতি গড়ে তুলেছে।

এদের আর্থিক অবস্থা ভালো না হওয়ায় তাদের ঘর-বাড়ি মাটির তৈরি। খড় বা খাপরা দিয়ে ছাউনি। কেউ কেউ ইঁট দিয়ে ঘর তৈরি করে থাকে। সেগুলির ছাউনি দিতে টিন বা অ্যাসবেস্টাস বা টালি ব্যবহার করে। এদের ঘরগুলো বেশি উঁচু নয়। ঘরের মধ্যে দুটি বা তিনটি কক্ষ থাকে। ঘরের দরজা ছোট ও নিচু। কোনো ঘরে থাকে ছোট জানালা। জানালা না থাকলে ছাউনির নিচে গোল ঘুলঘুলি রাখে। ঘরের উঠোনে থাকে তুলসী মঞ্চ ।

খাদ্যাভ্যাস : ডোম জাতির প্রধান খাদ্য ভাত। অনেকে রুটি,মুড়িও খায়। এরা ভাতের সাথে ডাল, শাক-সব্জি খায়। এরা মাছ খায়। হাঁস,মুরগি ও ছাগলের মাংস খেতে ভালোবাসে। এখানে কালিন্দীরা গোমাংস খায়। এছাড়াও এরা শূকর মাংস, ঘোড়ার মাংস, পাখির মাংস, মেঠো ইঁদুরের মাংস, মৃত পশুর মাংসও এরা খায় ।

ব্যবহারিক সামগ্রী : সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে ডোমরা। এরা আগে লোহার বাসনপত্র ব্যবহার করতো । ভারী বলে সেগুলোর ব্যবহার কমে গেছে। তার বদলে হাল্কা অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি, কড়াই, থালা, বাটি, গ্লাস, জামবাটি ইত্যাদি বাসনপত্র ব্যবহার করছে।

তাদের ঘরে গেলেই সবসময় বাঁশ ও বেতের ঝুড়ি,কুলা, টুপা,ডালা ইত্যাদি নানা জিনিসপত্র দেখতে পাওয়া যায়। তৈরি করার সাথে সাথে তারা ব্যবহারিক জীবনেও এইসব সামগ্রী ব্যবহার করে থাকে । বাজুনিয়া ডোমদের ঘরে ঢাক, ঢোল, সানাই, বাঁশি ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গানো থাকে ।

সাজ-পোশাক : ডোম জাতির পুরুষেরা পরে ধুতি, গেঞ্জি, জামা, পাঞ্জবি ও লুঙ্গি । মেয়েরা পরে শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা জামা প্যান্ট, ফ্রক, স্কার্ট ইত্যাদি পরে ঘুরে বেড়ায় ।

প্রসাধন সামগ্রী : ডোম জাতির মেয়েরা বাজারে চলতি স্নো, পাউডার মাখে। চোখে কাজল পরে। ঠোঁটে লিপস্টিক লাগায় এবং নখে নখরঞ্জক ব্যবহার করে । উৎসব-অনুষ্ঠানে হাতে মেহেন্দি লাগায়। রং বেরঙের ফিতে, ক্লীপ দিয়ে নানা ভঙ্গিতে চুল বাঁধে । চুলে সুগন্ধি তেল লাগায় । বাজারে চলতি সাবান, শ্যাম্পু ব্যবহার করে। সভ্যতার বিবর্তনের সাথে সাথে এদের সাজ-পোশাকেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় ।

অলংকার : ডোম জাতির মেয়েরা রূপার গয়না পরতে বেশি ভালোবাসে। তাদের পছন্দের গয়নার মধ্যে ইমিটিশানের হার, বালা, দুল, পায়ের মল ইত্যাদি জনপ্রিয়। নিজেকে সুন্দর করে তোলার জন্য তারা হাত ভর্তি রঙবেরঙের কাঁচের চুড়ি পরে ।

জীবিকা : ডোম জাতির জীবিকা এক রকমের নয়। এদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে জীবিকার পার্থক্য রয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন জীবিকার জন্য তাদের উপসম্প্রদায়গুলির নামকরণ করা হয়েছে। ডোম জাতির ঐতিহ্য হল বাঁশ ও বেতের ঝুড়ি,চাঙ্গাড়ি তৈরি করা। কেউ কেউ ভূমিহীন কৃষক মজুর। বাজুনিয়ারা উৎসব উপলক্ষ্যে ঢাক, ঢোল, নহবৎ, সানাই প্রভৃতি বাজনা বাজিয়ে টাকা রোজগার করে ।

বাঁশফোড়রা সাধারণত ঝুড়ি, টোপা,কুলো, পাখা,ঝাঁটা প্রভৃতি বানিয়ে হাটে,বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। ধাকাল ধেসিয়া বা তাপসপুরিয়া শ্রেণির ডোমেরা শবদেহ বহন করে অর্থাৎ ধাঙড়ের কাজ করে ।

ধর্ম : ডোম জাতির মানুষ শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। তবে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি এদের আনুগত্য বেশি ।

দেব-দেবী : ডোম জাতির মানুষেরা অনেক দেব-দেবীর পূজা করে। তাদের প্রধান দেব-দেবী হল- মনসা, শিব,কালী, টুসু, ভাদু, হাতিখেদা, আখ্যান, বুঢ়াবাবা,খেলাইচণ্ডী, ধর্ম ঠাকুর, গুঁসাই ঠাকুর, রাঙ্গাহাড়ি, বিষাইচণ্ডী ইত্যাদি। ডোমরা নিষ্ঠার সাথে বাবা ভোলানাথের পূজা করে। পুজোর সময় মানত রেখে ভক্তা হয়।

বৈশাখ মাসে জঙ্গলে গিয়ে কুলদেবী কালুবীরের পূজা করে । তাঁর উদ্দ্যেশে ছাগ, মিষ্টান্ন, ফল উৎসর্গ করে । জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তিতে তারা ধর্মরাজ বা ধর্ম ঠাকুরের পূজা করে । তার পূজার সামগ্রী হল চাল, গুড়, কলা এবং চিনি। ডোম ছাড়া অন্য কেউ ধর্ম ঠাকুরের পূজা করতে পারে না। এরা ধর্ম ঠাকুরের পুরোহিত ।

শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসা পূজার দিন বিকেলে পুকুরে গিয়ে পান, সুপারি দিয়ে মনসা দেবীকে নিমন্ত্রণ করে আসে। অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে মনসা দেবীর আরাধনা করে থাকে । দুর্গাপূজার সময় 'বাজুনিয়া' ডোম ঢাক পূজা করে ।

ডোম জাতির মধ্যে যারা কালীর সাধক তাদের পদবি কালিন্দী । ডোম জাতির লোকেরা চাষের কাজে নামার আগে তারা মুর্গা বলি দিয়ে লোকদেবতা ভাঁও ঠাকুরের পূজা করে ।

ডোম জাতির মধ্যে যারা পুরোহিতের কাজ করে তাদের দেঘরিয়া বা ডোম পণ্ডিত বা ধর্ম পণ্ডিত বলেন। নিম্ন শ্রেণির ব্রাহ্মণ তাঁরা 'বর্ণ ব্রাহ্মণ' নামেও পরিচিত।

লোকবিশ্বাস : ডাইনি, তুকতাক, ঝাড়ফুঁক,মন্ত্রতন্ত্র প্রভৃতি লোক বিশ্বাস আজও এদের সমাজে রয়ে গেছে। পুরুলিয়ার মানুষ বিশ্বাস করে ডোমদের বাজনা না বাজলে কোনো শুভ কাজ সম্পন্ন হয় না। 'আগে ডমনা পরে বামনা'- এই প্রবাদেই তার প্রমাণ রয়েছে। তাই যে কোনো অনুষ্ঠানে সবার আগে ডোমদের ডাক পড়ে।

লোকসংস্কার : ডোমদের সমাজে জন্ম, বিবাহ,মৃত্যুকে নিয়ে নানা সংস্কার রয়েছে ।

ক. জন্ম-সংস্কার : ডোম সমাজে জন্মকেন্দ্রিক বিবিধ সংস্কার রয়েছে । যেমন-

১. ডোম প্রসূতিকে ন' মাসে সাধ খাওয়ানো হয় । গর্ভবতী নারীকে নয়টি জিনিস রান্না করে খেতে দেয়।

২. বাড়িতে শিশু সন্তান জন্মানোর পর এরা দরজায় আওয়াজ করে। কেউ খড়ের চালে শব্দ করে। এর মধ্য দিয়ে শিশুটি সুস্থ, স্বাভাবিক কি না তা বুঝতে পারে।

৩. ধাই হাড়িরা এসে নাড়ি কাটে। শিশু সন্তান জন্মানোর পর পরিবারে অশৌচ চলে। পাঁচ- সাত দিন দেব-দেবীর পূজা বন্ধ রাখা হয়।

৪. তিন দিন প্রসূতিকে খেতে দেওয়া হত না। চতুর্থ দিনে প্রসূতিকে 'ঝালভাত' খাওয়ানো হয়।

৫. মেয়ে সন্তান জন্মানোর ছয় দিনে ,ছেলেদের সাত বা নয় দিনের পর 'লরাত' অনুষ্ঠিত হয়।ওই দিন নাপিত প্রথমে শিশুর নখ ও চুল কাটে। ধাইমা তেল-হলুদ মাখান। শিশুসন্তানকে স্নান করান। এরপর প্রসূতিকে নিয়ে পুকুর ঘাটে যান । নাপিত বউ নখ, চুল কেটে দেয়। পুকুরে জলে নেমে প্রসূতি স্নান করে। ধান,দূর্বা,কাজল ইত্যাদি দিয়ে ঘাটপূজা করে থাকে।

৬. এরপর প্রসূতিকে পেঁপের তরকারি,করলা ভাজা,মুসুর ডাল খেতে দেয়। মাংসও খেতে দেয়। কিন্তু তাকে মাছ খেতে দেয় না। পাড়ার সবাইকে ডেকে তেল-হলুদ দেওয়া হয়।

৭. একুশ দিনে 'একুশা' পালন করা হয়। ষষ্ঠী বটতলায় একুশটি পিঠা দিতে হয়।

৮. ছয় মাস বা সাত মাস পর শিশুটির অন্নপ্রাশন হয়। মামাবাড়ি থেকে মুখে ভাতের আয়োজন করা হয় । নতুন জামা কাপড়, তোয়ালে, পাউডার, তেল, কোমরের বিছা ইতাদি শিশুটিকে পরতে দেওয়া হয় ।

খ. বিবাহ-সংস্কার : এদের সমাজে ছেলে-মেয়েদের বিয়ের সময় প্রচুর সংস্কার রয়েছে। যেমন-

১. ডোম জাতির মধ্যেও বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল । তবে বর্তমানে বাল্যবিবাহ অনেকাংশে কমে গেছে। তবে কন্যাপণ দেওয়ার রীতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

২. ডোম জাতির স্বগোত্রে বিবাহ চলে না। অন্য জাতির কোনো ছেলে বা মেয়েকে এরা বিয়ে করতে পারে না।

৩. ডোম জাতির মধ্যেও বহুবিবাহ প্রথা অনুমোদন যোগ্য। স্ত্রী মারা গেলে সন্তান প্রতিপালনের জন্য এরা ইচ্ছা করলে শ্যালিকাকে বিবাহ করতে পারে।

৪. বিয়ের সময় কড়ি পাতে।

৫. গায়েহলুদের দিনে বর ও কনে বাড়ির বাইরে বের হয় না ।

গ. মৃত্যু- সংস্কার : ডোম সম্প্রদায়ের মধ্যে মৃত্যু ঘিরে অজস্র সংস্কার রয়েছে । সংস্কার ছাড়াই এরা জীবনকে কল্পনা করতে পারে না । যেমন-

১. ডোমদের কেউ মারা গেলে তুলসী মঞ্চের সামনে দড়ির খাটিয়াতে মৃতদেহ রাখা হয়।

২. বউ যদি আগে মারা যায়, তাহলে আলতা পাড়ের কোনো জিনিস দেওয়া যায় না। মৃতব্যক্তিকে কম করে তেল-হলুদ মাখাতে হয়। আর স্ত্রী বেঁচে থাকলে মৃতব্যক্তির দেহে বেশি করে তেল-হলুদ মাখায়। তার পায়ে আলতা পরায়।

৩.তারা তুলসীমঞ্চে ধূপ জ্বালে। সেখানেই তিন পাক ঘুরে তিন বার পলাশ কাঠে মুখাগ্নি করে।

৪. তারপর মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যায়। চিতা সাজানো হয়। মৃতদেহের মাথা উত্তর দিকে রেখে চিতার ওপর শুইয়ে দেয়। মৃতদেহের ওপর ঘি দেওয়া হয়। বাড়ির বড় ছেলে মৃতদেহে আগুন দেয়। সে যদি অবিবাহিত হয় তাহলে তাকে চোখ বন্ধ করে চিতায় আগুন দিতে হয়।

৫. দাহ কার্য শেষ হলে পুকুরে বা নদীতে স্নান করে ঘরে আসে। আগুনের সেঁক নেয়। মৃতব্যক্তির অস্থি ত্রিবেণীতে বিসর্জন করতে যায়। সেখানে গিয়ে অস্থি বিসর্জনের পর তেল হলুদের ছিটে দিয়ে মাটিতে গড়াতে হয়। পুরুতের পায়ে তেল হলুদ ছোঁওয়ায়।

৬. এরপর তিনদিন পর্যন্ত মুখাগ্নিকারী ব্যক্তি তেল,মশালাযুক্ত নিরামিশ খাবার খাবে। তেল মাখতে পারবে । কিন্তু তিনদিনের পর থেকে আর তেল,মশলা খাবার খাওয়া যাবে না। চতুর্থ দিনে পুকুর ঘাটে বেনা গাছ লাগাতে হয়।

৭. পাঁচ দিন বা সাত দিন তাকে হবিষ্যি করতে হয়। সকালে শুকনো চিঁড়া ,সারা দিন ফল খেয়ে থাকতে হয়। রাত বারোটার সময় আতপ চালের ভাত ও আলু সিদ্ধ রান্না করে। সেই খাবারের কিছুটা প্রথমে মৃতব্যাক্তির উদ্যেশ্যে দান করে। তারপর সে খায়। এই সময় কোনো কিছুর শব্দ হলে সে আর খেতে পায় না।

৮. দশ দিনে ঘাটশ্রাদ্ধ হয়। ঘাটের দিন নিরাধারা উপোস করতে হয়। ঘাট থেকে ওঠার পর তুলসী তলায় ঠাকুর প্রণাম করে।

৯. বাড়ির গুরুজনদের প্রণাম করে। ধূপ দেয় । বুট(ছোলা) ভেজানো বা বুট(ছোলা) সিদ্ধ খেতে হয় । ফল ও দুধ খেতে পারে। কিন্তু মা মারা গেলে তার দুধ খাওয়া চলবে না।

১০. এগারো দিনে শ্রাদ্ধ হয়। পূর্ব পুরুষদের উদ্দেশ্যে পিণ্ড দান করতে হয়। তাদের উদ্যেশ্যে কিছু জায়গা দান করা,মূল্য দান করার রীতি রয়েছে।

১১. এরপর মুখাগ্নিকারীব্যক্তি ভিক্ষার ঝুলি নেয়। সেই ঝুলিতে আত্মীয় স্বজনরা চাল ও পয়সা দান করে । রাত্রিবেলায় মুখাগ্নিকারী ব্যক্তি প্রথমে রান্না করা খাবার পাতাতে উঠিয়ে রাখে। সবার খাওয়া শেষ হয়ে গেলে সেই খাবার নিয়ে শ্মশানের অর্ধেক পথ গিয়ে মৃত ব্যক্তিকে নাম ধরে ডাকে। সেখানে খাবার রেখে চলে আসে।

১২. তিন বছর মৃতব্যক্তির বাৎসরিক অনুষ্ঠান পালন করতে হয়।

১৩. ডোম জাতির মধ্যে মৃতদেহ কবর দেওয়ার রীতি রয়েছে। কলেরা বা বসন্তে মারা গেলে এবং তিন বছরের কম বয়সী শিশু মারা গেলে মৃতদেহ কবর দেওয়া হয়। কবরে মৃতদেহের মুখ থাকে নিচের দিকে। মাথা থাকে উত্তর দিকে ।

বিবাহরীতি : বিবাহের আগের দিন রাত্রিবেলায় অধিবাস অনুষ্ঠিত হয়। তেল-হলুদ দিয়ে বর ও কনের সারা শরীরের মাখাতে হয়। বর তেল-হলুদে ডোবানো সুতো বাঁধে ডান হাতের কব্জিতে আর কনে বাম হাতের কব্জিতে। ঐ সুতোয় দূর্বা ঘাসের গিঁট বাঁধা থাকে। কনের পোশাক হয় হলদে রঙের বা লাল রঙের । আর বরের পোশাক হয় হলদে রঙের, মাথায় লাল পাগড়ি থাকে।

বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে গেলে আশীর্বাদির দিন ঠিক করা হয়। সেই দিন তুলসী তলায় গোবর (ছুঁচ) মাটি মিশিয়ে মাড়ুলি দেয়। পাত্রপক্ষের লোক সন্ধ্যাবেলায় পাত্রীর বাড়িতে আসে। তারা সঙ্গে করে পাত্রীর জন্য আশীর্বাদির জিনিসপত্র আনে। তাদের আনা শাড়ি সায়া,ব্লাউজ,গয়না ইত্যাদি পরে কনে পাত্রপক্ষের সামনে বসে। একটি থালায় আতপচাল, ধান, দূর্বা, প্রদীপ রাখা হয়। পাত্রপক্ষের লোক কনেকে ধান,দূর্বা, পয়সা দিয়ে আশীর্বাদ করে।সে বড়দের প্রণাম করে । পাত্রীপক্ষের লোক একদিন পাত্রকে আশীর্বাদ করে আসে।

বিয়ের দুই বা তিনদিন আগে কনের বাড়ি থেকে লগ্ন আনতে যায়। সেখানে নতুন গামছায় আতপচাল,গোটা হলুদ,সুপারি, বিরি কলাই ইত্যাদি দিয়ে লগ্ন বাঁধা হয়। জামাইবাবু মাথায় গামছা বেঁধে লগ্ন নিয়ে আসে। পরিবারের লোকেরা হাত পা ধুইয়ে তাকে ঘরে ঢোকায়।

লগ্ন আনার পর বর বা কনে দুজনেই আইবুড়ো ভাত খেতে পারে । তাদের 'ক্ষীর ভাত' খাওয়ানো হয় । ভাত, তরকারি, মাছ, মাংস ইত্যাদি দিয়ে তারা আইবুড়ো ভাত খায় ।

আগে আইবুড়োভাত খাওয়ার দশ দিন পর বিয়ে হোত। বর্তমানে বিয়ের নিয়ম অনেক শিথিল হয়ে গেছে। অনেকের তিনদিনের লগন থাকলে তিনদিন ধরে আইবুড়ো ভাত খায়। তিনদিন ধরে বর ও কনের গায়ে হলুদ দিতে হয়। বরের সাথে জাঁতি থাকে আর কনের আঁচলে কাজললতা বেঁধে দিতে হয়।

এদের সমাজে এখন যে যার সুবিধে মতো বিয়ের দিন স্থির করে। মেয়ের বাড়ি অনেকে বিয়ের দিন লগ্ন খোলে। আইবুড়ো ভাত খায়। গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান হয়। অর্থাৎ একদিনেই সমস্ত বিয়ের কাজ সেরে ফেলা হয় । তবে সবাই এই কাজ করে না ।

বিয়ের দিন ছাদ্‌নাতলা তৈরি করা হয়। আম ডাল,মহুল ডাল,সিধা ডাল গাঁড়া হয়। লাঠির গায়ে আমপাতা বেঁধে দেয় । গুড় বা চিনি দিয়ে মা,মাসি,কাকিমা ইত্যাদি মেয়েরা বরের আম্ল খায় ।

এরপর ' জলসাহা' অনুষ্ঠান হয়। বিকেলের দিকে বাড়ির মেয়েরা জল সাইতে যায়। বেল ফুল, ধান, পান পাতা, আতপ চাল, দূর্বা দিয়ে মা পুকুর ঘাটে পূজা দেয় । হাঁড়িতে জল ভরে ঘরে নিয়ে আসে। বর স্নান করে । বিয়ের জন্য তৈরি হয় ।

কনের বাড়িতে বর হাজির হয় । কনের মা বরকে ধান, দূর্বা দিয়ে বরণ করে । জলসাওয়ার হাঁড়ি থেকে আমপাতা দিয়ে জলের ছিটা দেয় । বরকে মিষ্টি ও জল খাওয়ায়। কনের বাবা বা দাদা বা জামাইবাবু বরকে কোলে করে ঘরে নিয়ে যায় ।

কনের বাড়িতে ছাদ্‌নাতলায় মা, কাকিমা, মাসিমা কনের আম্ল খায়। কনে ঘরে চলে যায়। ভাসুর ঘোমটা উঠিয়ে মেয়েটিকে ছুঁইয়ে থাকে। এরপর মেয়ের বাবা,মা কোলে করে বরকে ছাদ্‌না তলায় আনে। পিঁড়িতে দাঁড় করিয়ে দেয়। বরের চারদিকে মেয়েরা সাতরকমের জিনিস হাতে নিয়ে সাততী ঘোরে। কনের দাদা বা জামাইবাবু বাচা ডালিতে কনেকে বসিয়ে ছাদ্‌না তলায় নিয়ে আসে। ঘোমটায় কনে তার মুখ ঢেকে রাখে। বরের চারপাশে ঘোরায়। তারপর মালাবদল হয়। প্রথমে আকন্দ ফুলের মালা এবং পরে গুয়া-পৈতার মালা নিয়ে একে অপরকে পরিয়ে দেয়। এরপর গাঁট বন্ধন করা হয়।

সিঁদুর দান অনুষ্ঠান শুরু হয়। একটি ডালায় সাতরকমের জিনিস থাকে। বর-কনে দুজনকেই সিঁদুর খেলতে হয়। বর প্রতিটি পান পাতায় সিঁদুর দেয়। তারপর কনে সেই পাতাগুলো থেকে অল্প সিঁদুর নামিয়ে রাখে। বর এক হাতে পুরো সিঁদুর ঢেলে কনের মাথায় ঘষে দেয়। কেউ জাঁতি দিয়ে সিঁদুর দান করে। সিঁদুর দান হয়ে গেলে বরকনে ছাদ্‌না তলায় সাতবার প্রদক্ষিণ করে ঘরের ভেতরে চলে যায়। বর-কনেকে মিষ্টিমুখ করানো হয়। তারা একে অপরের এঁটো খাবার খায়। আবার দুজনকে ছাদ্‌না তলায় নিয়ে আসে।

বিয়ের পরের দিন সকালবেলা জলের মধ্যে ঘটি, জাঁতি লুকিয়ে রাখে। বর-কনে দুজনকেই এই খেলাটি খেলতে হয়। বর লুকায় কনে খুঁজে বের করে। আবার কনে লুকোলে বর সেটি খুঁজে দেয়। এভাবে তিনবার খেলাটি চলে। বাঁদানি অনুষ্ঠান শুরু হয়। বর-কনেকে ধান,দূর্বা দিয়ে ও টাকা-পয়সা দিয়ে পরিবারের ও প্রতিবেশীরা আশীর্বাদ করে ।

ধীরে ধীরে সময় গড়িয়ে যায়। আসে বর-কনেকে বিদায় জানানোর সময়।মা আঁচল পেতে কনের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে । কনে এক আঁজলা চাল নিয়ে মায়ের আঁচলে ফেলে দেয়। পেছনে ফিরে সে আর তাকাতে পারে না । কিছুটা এগিয়ে রাস্তার মধ্যে দুজনকে শেষবারের মতো মিষ্টি খাওয়ায়। বরের বাড়ির উদ্যেশ্যে তারা রওনা দেয় ।

বরের বাড়িতে বর-বধূকে ঘটিতে আম পাতা ডুবিয়ে জল ছিটিয়ে বরণ করে ঘরে নিয়ে যায়। একটি থালায় দুধে আলতা গুলে রাখে। তার মধ্যে বধূ দুটো পা ডোবায়। সে প্রথমে ডান পা ফেলে। তারপর বাঁ পা। এভাবে সে ঘরে ঢোকে। বধূর মুখ দেখে পাড়া-প্রতিবেশীরা উপহার দেয় ।

সামাজিক রীতিনীতি : ডোমদের মধ্যে দয়া,মায়ার বড় অভাব। এরা নিষ্ঠুর প্রকৃতির। তাই সমাজের লোক তাদেরকে ভয়ের চোখে দেখে। মনসা পূজার আগের দিন এরা চুল, দাঁড়ি কেটে ফেলে। ব্রাহ্মণ এদের পূজার্চনা করে না। এরা ধর্ম ঠাকুরের পুরোহিত হন।

সমাজ অনুশাসন পদ্ধতি : আদিকালে এদের সমাজে গ্রাম অনুশাসন পদ্ধতি ছিল। সমাজের মধ্যে সমাজপতিদের শাসন অত্যন্ত প্রবল। অন্যায় অপরাধ করলে গ্রামের মোড়ল তার শাস্তি বিধান করে। এখন থানা-পুলিশের ভয়ে তারা অনেকটা আচার-আচরণকে সংযত করেছে। বর্তমানে বিচারের আশায় পঞ্চায়েতে যায়।

ট্যাবু বা নিষেধাজ্ঞা : কোনো ধোবার পরিত্যক্ত খাবার কোনো ডোম স্পর্শ করবে না। এমন কি জল, মিষ্টান্ন গ্রহণও নিষিদ্ধ ছিল।

লোক উৎসব : পুরুলিয়ার শিবের গাজন একটি বড় লোকউৎসব। গাজনের দশ-পনেরো দিন আগে থেকে ডোমেরা শিবকে জাগাবার জন্য বাজনা বাজিয়ে পূজার সূচনা ঘটায়। কেউ কেউ মানত রেখে ভক্তা হয়। মনসা পূজায় আনন্দে মেতে ওঠে ডোম জাতির নর-নারীরা। টুসু,ভাদু পূজা,রহিন উৎসব, বাঁদনা, গরাম দেবতার পূজা ইত্যাদি অত্যন্ত জাঁক জমকের সাথে তারা পালন করে।

ভাষা : পুরুলিয়ার আদিম ডোম জাতি 'মানভুঁইয়া' বা 'মানভূমি' উপভাষায় কথা বলে। আর শিক্ষিত লোকেরা বলে রাঢ়ী বাংলায়।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারা : সামাজিক অনুষ্ঠানে বাজনা বাজাবার জন্য ডোমদের বিশেষ কেউ ডাকে না। এছাড়াও সমাজে বাঁশের তৈরি জিনিসপত্রের চাহিদাও কম। এসবের ফলে ডোমদের রুজি রোজগারের পরিমাণ কমে গেছে। এর ফলে তারা আর্থিক অস্বচ্ছলতায় ভোগে। দুঃখ-কষ্ট তাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। সামাজিক সুরক্ষার দায়ভার সরকার বহন করছে বলে ডোম জাতির মানুষ এতে বহুলাংশে উপকৃত। একশ দিনের কাজ, গ্রামীণ আবাস যোজনা ইত্যাদির মাধ্যমে তার বাঁচার রসদ পেয়েছে।

৪.বাগদি

পুরুলিয়া জেলার প্রাচীন তফসিলি জাতিগুলির মধ্যে অন্যতম হল বাগদি। এরা একসময় মল্ল রাজাদের আমলে স্বাধীন, স্বতন্ত্র এবং যোদ্ধাজাতি হিসেবে পরিচিত ছিল।

নৃতাত্ত্বিক পরিচয় : পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তে গ্রামে-গঞ্জে বাগদি জাতির লোকেদের বসবাস করতে দেখা যায়। নৃতাত্ত্বিক দিক দিয়ে বলা যায় এদের উৎপত্তি দ্রাবিড় গোষ্ঠী থেকে। এদের গায়ের রঙ ও বৈশিষ্ট্য দেখে বোঝা যায় এরা আদিম মানব গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

বাগদি জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে একটি কিংবদন্তি লোকসমাজে প্রচলিত আছে। তা থেকে জানা যায় যে পার্বতীর গর্ভে ও শিবের ঔরসে বাগদিদের জন্ম।

আবার নৃতাত্ত্বিক গবেষক ড. অতুল সুর ' ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ' অনুসারে বলেছেন পিতা ক্ষত্রিয় এবং মাতা বৈশ্য- এই দুই সংমিশ্রণে বাগদি জাতির সৃষ্টি। ('বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন',পৃ-২০৫)।

চেহারার বৈচিত্র্য : এদের মাথা লম্বা থেকে মাঝারি, গায়ের রং কালো । এরা বেঁটে হয় । এদের নাক চ্যাপ্টা ও চওড়া। ঢেউ খেলানো তামাটে চুল দেখা যায়। কারো কারো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বাবরি চুল রয়েছে । চেহারার এইসব বৈচিত্র্য দেখে বোঝা যায় বাগদি জাতির মধ্যে আদি- অস্ত্রাল বা প্রোটো অস্ট্রালয়েডের প্রভাব রয়েছে।

সামাজিক বিন্যাস : এদের সমাজে সামাজিক বিন্যাসের নানা বৈচিত্র্য চোখে পড়ে ।

ক. উপসম্প্রদায় বা উপবিভাগ : বাগদি জাতির মধ্যে বেশ কয়েকটি উপবিভাগ রয়েছে। ১) তেঁতুলিয়া , ২) কসাইকুলিয়া , ৩) দুলিয়া , ৪) ওঝা , ৫) মাছুয়া , ৬) গুলি মাঁঝি, ৭) দণ্ড মাঝি, ৮) কুসুমেটিয়া , ৯) মল্লমেটিয়া। এছাড়াও কিছু উপগোষ্ঠী রয়েছে। উপবিভাগের মধ্যেই পরিচিতি রয়েছে ।

১) তেঁতুলিয়া- এরা বাগ, সাঁতরা, রাই, খান, পুইলা পদবি ব্যবহার করে।
২) কসাইকুলিয়া- এদের পদবি মাঝি, মশালচি , পালঙখাই, ফেরখা।
৩) দুলিয়া – সরদার, ধাড়া পদবি ব্যবহার করে।
সমাজে তেঁতুলিয়া বাগদিরা অন্যান্য গোষ্ঠীর চেয়ে ওপরে অবস্থান করে।
পুরুলিয়া জেলায় তেঁতুলিয়া বাগদি,মাছা বাগদি রয়েছে।

খ. গোত্র : বাগদি জাতির মোট বারোটি গোত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। গোত্রগুলি হল-ক) শোল মাছ,খ) শাঁখ, গ) কচ্ছপ ঘ) বাঘ,ঙ) পুকুড়ি (এক ধরনের মাছ), চ) কাল সাপ, ছ) পলাশ গাছ, জ) কাশিবক, ঝ) কাঠ ফড়িং, ঞ) সূর্য, ট) চাঁদ, ঠ) চড়ুইপাখি।

আবার তরুণদেব ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন- ' গোত্র বা প্রবরের মধ্যে আছে- পঙ্কঋষি বা বনমুরগী, শালঋষি বা শোলমাছ, পাতঋষি বা কড়াইশুঁটি ও কচ্ছপ । ' [৪]

রিসলের মতে প্রসিদ্ধ 'কাশবক', 'পনকৃষি','শালঋষি', 'পাত্রিশি', 'কচ্ছপ' ইত্যাদি। ক্ষেত্র সমীক্ষায় জানা যায় বাগদি জাতির গোত্র আড়স্য ।

গ. পদবি : এই জাতির অধিকাংশ মানুষ 'বাগদি' পদবি ব্যবহার করে। এছাড়াও রাউত, সর্দার, দিগার, প্রতিহার, লিয়ার মাঝি, মাঝি, খাওয়াস, কপাট, চালক প্রভৃতি পদবিও তারা ব্যবহার করে ।

বাসস্থান : জীবিকার তাগিদে বাগদিরা সাধারণত খাল বিল ও নদীর তীরে বসতি গড়ে তুলত। তাদের বাড়িগুলো অনেকাংশে বাউরিদের ঘরের মতো। ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরে তারা বাস করে। সেগুলি মাটির তৈরি। ঘরের চালাগুলোর কোনোটা খড়ের বা লাড়ায় ছাওয়া। আবার কোনো কোনো ঘর টালি, খাপরা দিয়ে ছাওয়া। ঘরগুলোতে দুটি কক্ষ থাকে। ছোট একটি জানালাও চোখে পড়ে। ঘরের পাশে থাকে উঠোন। সেখানে গুগলি, শামুকের খোলা জমে থাকে। আর থাকে তুলসীমঞ্চ। আর্থিক অবস্থাপন্ন বাগদি ইঁটের পাকাবাড়িতে বাস করে। সেগুলি টিন, অ্যাডবেস্টাসের ছাউনি দেওয়া ।

খাদ্যাভ্যাস : বাগদি জাতির লোকেরা ভাত খায়। জলজ শাকপাতা, ছোট মাছ, গুগলি, শামুক, মাংস, ডিম ইত্যাদি খাবার খায়। এছাড়াও চিড়া,মুড়ি,গুড়,খই, ছাতু ইত্যাদি তারা খেয়ে থাকে।

বাগদি জাতির কেউ কেউ গোমাংস , শূকর মাংসও খেয়ে থাকে। দুলিয়া বাগদি কচ্ছপ মাংস খায়। সারাদিনের ক্লান্তি দূর করার জন্য পুরুষরা হাইড়্যা মদ খায়।

ব্যবহারিক সামগ্রী : বাগদিদের ঘরেও এখন আর তেমন মাটির তৈরি বাসনপত্র চোখে পড়ে না। তার বদলে হাল্কা ও টেকসই অ্যালুমিনিয়াম ও স্টিলের বাসনপত্র তারা ব্যবহার করে । এছাড়াও প্লাস্টিকের তৈরি কলসি, বালতি, মগ ব্যবহার করছে। চা খাওয়ার জন্য তারা ব্যবহার করে চীনামাটির কাপ, প্লেট।

বাগদি জাতি এককালে যোদ্ধা জাতি হিসাবে পরিচিত ছিল। তাই তাদের ঘরে বাঁশের লাঠি, টাঙ্গি, তলোয়ার, ছুরি ইত্যাদি নানা রকম অস্ত্র তাদের ঘরে এখনও দেখতে পাওয়া যায়। লোহার কুড়ুল, কাস্তে, কোদাল, শাবল ইত্যাদি যন্ত্রপাতি ও তাদের দৈনন্দিন কাজের ব্যবহার সামগ্রী। ঘরের দেওয়ালে টাঙানো থাকে চৌঘড়া জাল আর মাছ ধরার ঘুনি।

সাজ-পোশাক : বাগদি মেয়ে সুতোর ছাপা শাড়ি খাটো করে, আঁটোসাঁটো ভাবে পরে। পুরুষরাও খাটো করে হাঁটুর ওপরে ধুতি পরে। জলে নেমে কাজ করার জন্যই তদের এরূপ পোশাক পরা। ছোট ছোট ছেলে গায়ে দেয় গেঞ্জি, শার্ট। মেয়েরা পরে ফ্রক, শালোয়ার, চুড়িদার। যুবক-যুবতীরা হাল ফ্যাশনের পোশাক পরতে ভালোবাসে।

উৎসব-অনুষ্ঠানে বাগদি মেয়েরা চকচকে জমকালো, উজ্জ্বল রঙের পোশাক পরতে ভালোবাসে। শীতকালে সোয়েটার, মোটা সুতির চাদর, কম্বল, কাঁথা ইত্যাদি ব্যবহার করে।

প্রসাধন সামগ্রী : বাগদিদের ঘরের দেওয়ালে টাঙানো থাকে প্লাস্টিক বা কাঠের আয়না। চুল আঁচড়াবার জন্য থাকে কাঠের বা প্লাস্টিকের চিরুনি। ছেলে-মেয়ে সকলে গায়ে,মাথায় সাবান,শ্যাম্পু, তেল মাখে।
বিবাহিত মেয়েরা আলতা ও সিঁদুর পরে। রঙিন ফিতে দিয়ে মাথার চুল বাঁধে। যুবতী নারীরা ঠোঁটে লিপস্টিক, মুখে ক্রিম-পাউডার লাগায়। কপালে রঙবেরঙের টিপ পরে। চুলে ক্লীপ লাগিয়ে নিজেকে সুসজ্জিত করে তোলে।

অলংকার : বাগদি ঘরের মেয়েরা আগে সোনা- রূপোর গয়না বেশি পরতো। তবে বর্তমানে সোনা-রূপার মূল্য বেড়ে যাওয়ার দরুণ এরা ইমিটিশানের গয়না পরে। কম দামে সুন্দর সুন্দর নকল সোনার অলংকারগুলি উৎসব-অনুষ্ঠানে পরে ঘুরে বেড়ায়।

জীবিকা : বাগদি জাতির নির্দিষ্ট কোনো জীবিকা নেই। রিসলের মতে এদের আদিম জীবিকা ছিল মৎস্য শিকার বা মাছ ধরা। 'তেঁতুলিয়া' এবং 'কসাইকুলিয়া' বাগদি পুরুষেরা রাজমিস্ত্রীর কাজ করে। পান ও সুপুরি দিয়ে পান খেতে যে চুন লাগে, সেই চুনের যোগান দেয়। দুলিয়া বাগদি পালকি বা ডুলি বহন করে। এছাড়াও অন্যান্য উপগোষ্ঠীর সাথে এরা মাছ ধরে। চটের থলে বানায়, সুতো কাটে, হোলি উৎসবের জন্য আবির তৈরি করে। এদের কারো কারো কৃষিজমি আছে ঐ জমিতে অধিকাংশ বাগদি চাষবাস করে।

ধর্ম : বাগদি জাতি হিন্দু ধর্মাবলম্বী। এরা শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত। আদিতে বাগদিরা প্রকৃতি ও বন্য জন্তুর উপাসক ছিল।

দেব-দেবী : বাগদি জাতির কূলদেবী হলেন - মা মনসা। এছাড়াও এরা মা কালীর ভক্ত। আদিতে বাগদিদের প্রধান দেবতা ছিলেন ' বড়পাহাড়ী' এবং ' গোঁসাই এরা'।বাগদি জাতির জীবন ও জীবিকার কেন্দ্রভূমি ছিল জল আর জঙ্গল। এসব এলাকায় বিষধর সর্পের বাস। যে কোনো মুহূর্তেই সাপের ছোবলে তারা মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়তো। তাই সর্পদেবী মনসাকে তুষ্ট রাখার জন্য তারা মানত রেখে পূজা দিতেন। পুরুষানুক্রমে সেই মনসা পূজা চলে আসছে। শ্রাবণ মাসে ধুমধাম করে এরা মনসা পূজা করে। এরা সাতবহিনী, কুদরা , মা ভবানী, শিব , বুড়াবাবা, মেঘা বুড়ি, ভাদু,টুসু ইত্যাদি লৌকিক দেব-দেবীর পূজা করে।

লোকবিশ্বাস : রোগ ব্যাধি হলে বাগদিরা ওঝার কাছে নিয়ে যায় ঝাড়ফুঁক দেওয়ার জন্য। সখ্যান, গুণিন, ডাইনি, অপদেবতা ইত্যাদিতে এদের গভীর বিশ্বাস। এই বিশ্বাস দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে। তা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন হয় নি। মনপ্রাণ থেকে তারা ভুলতে পারে নি।

লোকসংস্কার : এদের সমাজে জন্ম-বিবাহ-মৃত্যুকে কেন্দ্র করে অজস্র সংস্কার জনমানসে প্রতিফলিত। যেমন-

ক. জন্ম-সংস্কার : শিশু সন্তান জন্মগ্রহণের পর বাগদি জাতির লোকেরা নানান লোকসংস্কার মেনে চলে। যেমন-

১. বাগদি ঘরে কোনো শিশু জন্মালে ডোমরা বাজনা বাজায়। এরা টাকা-পয়সা,থালা, বাটি নেয়।

২. পরিবারের মেয়েরা প্রসূতিকে ঘি ও চিঁড়া খাওয়ায়।

৩. ন' দিনের দিন হয় 'লারতা' অনুষ্ঠান। ওই দিন পাড়ার সবাই শিশুকে তেল-হলুদ মাখায়। নাপিত এসে নখ কাটে। সবাই পুকুরে স্নান করে অশৌচ দূর করে। নতুন জামা কাপড় পরে। প্রসূতি ও পরিবারের মেয়েরা আলতা আর সিঁদুর পরে।

৪. একুশ দিনের দিন 'একুশা ' পালন করে। ডোমরা মাঙ্গলিকী পসরা ঢাক-ঢোল সানাই নিয়ে গৃহস্থের বাড়িতে উপস্থিত হয়। ধাইমা, শাশুড়িমা, ঠাকুমা চিঁড়া-গুড় ভোগ খায়। ষষ্ঠীতলায় প্রসূতি ষষ্ঠীমাকে একুশটি পিঠে, ধান, দূর্বা, কাজল, বুকের দুধ দিয়ে পূজা দেয়। ধাইমা, পরিবারের অন্যান্য মেয়েরা সেখানে প্রণাম করে।

৫. এরপর শিশুর অন্নপ্রাশনের আয়োজন চলে।

খ. বিবাহ-সংস্কার : বাগদি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ সংক্রান্ত বিবিধ সংস্কার চোখে পড়ে। সেগুলি হল-

১. আদিকালে বাগদিরা নিজেদের গোষ্ঠী বা উপবিভাগের বাইরে বিবাহ করতো না। বলা যায় একজন তেঁতুলিয়া অন্য তেঁতুলিয়াকে অবশ্যই বিবাহ করবে ,কিন্তু শালঋষি গোষ্ঠীর পুরুষ ঐ গোষ্ঠীর মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে না। পিতৃ বা মাতৃকূলের কাকা-কাকিমা , জ্যাঠা-জেঠিমার সম্পর্কযুক্ত ছেলে বা মেয়ের বিবাহ এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয়। তিন পুরুষ পর্যন্ত এরূপ বিধি নিষেধ মানা হয়।তবে বর্তমানে নিয়ম শিথিল হয়েছে।

২. কোনো বাগদি ছেলে একসঙ্গে দুই বোনকে বিবাহ করতে পারতো। একটি ছেলের পক্ষে একাধিক নারীকে বিবাহ করতে কোনো বাধা ছিল না। তবে বর্তমানে এইসব রীতি আর বিশেষ দেখা যায় না।

৩. তেঁতুলিয়া বাগদি ছাড়া অন্য উপগোষ্ঠীর মধ্যে বিধবারা পুনরায় বিবাহ করতে পারে অর্থাৎ ' সাঙ্গা' করতে পারে। এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য ব্রাহ্মণদের প্রয়োজন হয় না। তাই মন্ত্রোচ্চারণ,পবিত্র অগ্নিশিখা অনুপস্থিত থাকে। 'সাঙ্গা' অনুষ্ঠানে মাদুরের ওপর বর-কনে মুখোমুখি বসে। গুঁড়ো হলুদ ও জল মিশিয়ে একে অপরের কপালে প্রলেপ এঁকে দেয়। পরে একটা চাদর দুজনের মাথার ওপর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এই

সময় বর একটা লোহার বালা কনের বাম হাতে পরিয়ে দেয়। আত্মীয় স্বজনদের ভুরি ভোজনের ব্যবস্থা করে থাকে।

৪. কোনো বিধবা তার মৃত স্বামীর ছোট ভাইকে বিবাহ করতে পারে।

৫. পাত্রপক্ষ–পাত্রীপক্ষ উভয়ের কথাবার্তার মাধ্যমে পাত্র-পাত্রীর বিয়ে স্থির হয়। ছেলেদের কিছু দাবী দাওয়া থাকে। সেগুলি মেনে নিয়েই বিয়ে ঠিক হয়। ভালো দিন দেখে বরপক্ষ মেয়েকে আশীর্বাদ করতে আসে। তুলসী তলায় আশীর্বাদ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বরপক্ষ কনেপক্ষকে আশীর্বাদির জিনিসপত্র দেয়। কনে সেই আশীর্বাদের শাড়ি, সায়া,ব্লাউজ,গয়না পরে বরপক্ষের সামনে হাজির হয়। ধান, দূর্বা, মিষ্টি,টাকা,গয়না ইত্যাদি দিয়ে তারা কনেকে আশীর্বাদ করে। একইভাবে কনে ঘরের লোকেরা জামা,প্যান্ট,গেঞ্জি,তোয়ালে, আংটি,ঘড়ি,মোটর সাইকেল ইত্যাদি জিনিসপত্র দিয়ে বরকে আশীর্বাদ করে আসে।

৬ . বাগদি জাতির মধ্যে 'শালা ধুতি' দেবার রীতি আছে। আইবুড়ো ভাতের ধুতি শালাকে দিয়ে যেতে হয়।

৭. লগ্ন আনার সময় 'লগন ভাঁড় ' কোথাও নামানো যায় না। হাঁচি,কাশি করা যায় না।

গ. মৃত্যু সংস্কার : এদের সমাজে মৃত্যুকে ঘিরে নানান সংস্কার রয়েছে। যথা-

১. বাগদিরা মৃতদেহকে আগুনে দাহ করে।

২. বাগদিদের বারো দিনে ঘাট। আবার কেউ কেউ দশ দিনে ঘাট করে। .কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হলে এক জোড়া বাঁশ, চারটি মার্কিন লাগে।কোনো মহিলার মৃত্যু হলে তাকে ফুল, মালা, চন্দন দিয়ে সাজায় । সিঁদুর, আলতা পরানোর রীতি আছে ।

৩. মৃতদেহের পাশে পেরেক পুঁতে দেয়। মৃতদেহের গায়ে মধু,চন্দন মাখায়। বুকে লিখে দেয় হরিনাম। দোপথের রাস্তা পর্যন্ত গোবরের ছড়া ও ঝাঁট দিতে হয় । সেইস্থানেই গোবর ও ঝাড়ুটা ফেলে আসতে হয়।

৪. মৃত নারীর শাঁখা,চুড়ি,সব কিছু খুলে রাখে। এরপর মৃতদেহ উপুড় করে হাতগুলো পেটের ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। পলাশডালে ঘি লাগিয়ে ঘরের বড় ভাই বা ছোটো ভাই মুখাগ্নি করে । চিতায় শ্মশানযাত্রীদের সকলে ছোট ছোট কাঠ দেয় । দাহ করার পর অষ্ট অঙ্গের আটটি হাড়, আটটি খুচরো পয়সা, আটটি কড়ি, তিল, যব, খই প্রভৃতি একটি ভাঁড়ে রাখে । অস্থি ও মাংসের পিণ্ড পুকুর ঘাটে নিয়ে যায় । ভাঁড় ভাঙ্গার পর পেছনে তাকাতে নেই । দোপথের রাস্তায় কুলের কাঁটা দেওয়া হয়। সেই কুলের কাঁটা সবাইকে ডিঙ্গিয়ে আসে। বাড়ি ফিরে সবাই স্নান করে । অস্থির ভাঁড়টির মুখ শক্ত পাঁক মাটি, কড়ি ও মার্কিন দিয়ে ভালো করে বন্ধ করে তুলসী তলায় মাটিতে গর্ত করে রাখে যাতে অশুভ শক্তির হাতে না পৌঁছোয়। গঙ্গা জলের ছিটা নেয়।শ্মশানযাত্রীরা পায়ের তলায় ও বুকে মাথায় ঘুঁটের আগুনের সেঁক নেয় । তুলসী তলায় তিন দিন ধূপ জ্বালতে হয়। অস্থিটাকে জাগিয়ে রাখার জন্য একজনকে রাত জাগতে হয় । ত্রিবেণীতে স্নান করে অস্থি বিসর্জনের কাজ শুরু করে । তিল,যব,কলা দিয়ে ব্রাহ্মণরা পূজায় বসে অস্থি বিসর্জন দেয়।মস্তক মুণ্ডন করে। বাড়ির চাল, আলু পয়সা ভিখিরিদের দান করে। অস্থি বিসর্জন দিয়ে ফেরার পর বাড়িতে ছোট মেয়ে বা বধূ পা ধোওয়ায়। অস্থি বিসর্জনের দিন বাড়িতে মুখাগ্নিকারী ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে নিয়ে ঘাটে বেনা গাছ পুঁতে। ত্রিবেণীতে যদি সাতপুরুষের নামে পিণ্ড দেওয়া হয় তাহলে কালীপূজার সময় বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করা হয় না। আবার কেউ

মারা গেলে তবেই আবার শ্রাদ্ধ হবে। অশৌচ চলাকালীন শুকনো মুড়ি,চিঁড়া খায় । আলু পোস্ত নুন দিয়ে সেদ্ধ ভাত খায়।

৫. তিনদিন পর 'তিতা ভাত' খায়। হবিষ্যি খাওয়ার পর ঐ গোবর ঝাড়ু ফেলার জায়গায় তিন, পাঁচ, সাত, নয় বিজোড় দিনগুলিতে তিনদিন হবিষ্যি দিয়ে আসে ।

৬. ঘাটের দিন নাপিত বউ আর ব্রাহ্মণকে ডাকে। মুখাগ্নীকারী ব্যক্তি মন্ত্র পাঠ করে বিভিন্ন নিয়ম পালন করে ।

বিবাহরীতি : বিয়ের দিন সকালে পাত্র বা পাত্রীকে বিবাহিত নারী বা পুরুষ বাঁধে স্নান করতে নিয়ে যায়। স্নানের ঘাটেই গায়ে-হলুদ অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয় । বাড়ির বৌদিরা পাত্র বা পাত্রীকে পায়েস, ক্ষীর, ভাত, মাছ রান্না করে খাওয়ায়। বর ও কনে নিজের নিজের বাড়িতে আইবুড়ো ভাত খায় । সেই এঁটোপাতে ছোট ছোট শিশুরা খাবার খায়।

বিকেলবেলা মা, বৌদি, কাকিমা, জেঠিমা সবাই দল বেঁধে পুকুর ঘাটে জল সাইতে যান । ডোম বাজনা বাজিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে। জামাইদাদা দা দিয়ে পুকুরের জল কেটে দেয় । দুদিকের জল দুই বৌদি হাঁড়িতে ভরে নেয়। মা থালায় আলতা, সিঁদুর নিয়ে জলে ভাসান । তারপর জলসাওয়ার হাঁড়ি এনে ছাদ্না তলায় সেটি রেখে দেয়। আমপাতা দিয়ে জল ছিটানো হয়। মেয়েরা গান গায়।

এরপর ছাদ্না তলায় গুটিখেলা হয়। বরের হাতে লাটাইয়ের সুতো দিয়ে শীতল বেঁধে দেয়। বাড়ির এয়োস্ত্রীরা 'সাততী' ঘোরে । এরপর বিবাহে যাওয়ার জন্য বর ধুতি, পাঞ্জাবি ও মাথায় টোপর পরে বর বেশে তৈরি হয় ।

ছাদ্না তলায় বরকে নিয়ে আসে। মহুল (মহুয়া)গাছের সাথে বরের বিয়ে দেয় । তারপর বরের বাড়ির মা, কাকিমা, মাসিমা সবাই বরের আল্ল খায়। সাততী ঘোরে । বর মায়ের বুকের দুধ খায়। কনে বাড়ির উদ্যেশে যাত্রা করে। বরযাত্রীরা কনের বাড়ি সূর্যাস্তের কাছাকাছি সময় অর্থাৎ গোধূলিলগ্নে পৌঁছায়। এটাই এদের বিবাহের রীতি।

কনের বাড়ির লোক বরকে বরণ করে। বর আমপাতা,গুড় চিবিয়ে কনের মার আঁচলে ফেলে। কনের মা বরকে মিষ্টি, জল খাওয়ায়। এরপর বরকে কনের বাবা বা মামা কোলে করে ঘরে নিয়ে আসেন। অনেক সময় কনের বান্ধবীরা বর ও বরযাত্রীদের পথ আটকায়। পাওনা চেয়ে বসে। সাময়িক বচসা বাঁধে । পাওনা দিয়ে বরযাত্রীরা ঘরে ঢোকে । কিছুক্ষণ বর বিশ্রাম নেয় । অন্যদিকে কনেকে নিয়ে কিছু লৌকিক আচার সেরে ফেলে । মা, জেঠিমা, মাসিমা সবাই কনের আল্ল খান ।

এরপর কোলে করে বরকে ছাদ্না তলায় বিয়ের আসরে নিয়ে আসে। বর পূর্বদিকে মুখ করে শালপাতার ছাউনির নিচে কাঠের পিঁড়িতে বসে। চারকোণে পাত্রে থাকে তেল, শস্যদানা, হলুদ। মাঝখানে থাকে জলের ছোট্ট একটা পুকুর। এরপর জামাইবাবু বা মামা বাচাডালিতে করে কনেকে ছাদ্না তলায় নিয়ে আসে। পান পাতায় সে মুখ ঢেকে রাখে। কনেকে সাত পাক ঘুরিয়ে বরের বিপরীত দিকে বসায়। ওদের মাঝে থাকে জলের পুকুর। শুভদৃষ্টি সম্পন্ন হয়। পুরোহিত বর, কনে ও কনে বাড়ির বয়স্ক ব্যক্তির ডান হাত একসাথে করে সুতো দিয়ে বেঁধে দেয়।পুরোহিত দক্ষিণা পেয়ে ঐ বাঁধন খুলে দেয়। তারপর বরের পাশে বসে মন্ত্র পাঠ, পূর্বপুরুষদের উদ্দ্যেশ্যে পূজা করা হয়। বর ও কনের বাবা দুজনে আঙ্গুলে খড়ের আংটি বানিয়ে পরে। কনের বাবা ধুতি,আংটি,চাল,আলু দিয়ে পাত্রকে বরণ করে। মন্ত্র পাঠের মধ্য দিয়ে বরের হাতে কনেকে সম্প্রদান করে ।এই পর্যায়ের নাম ' গোত্রদান'। কনের নিজের গোত্র পরিবর্তিত হয়ে স্বামীর গোত্র লাভ করে থাকে ।

এরপর 'মালাবদল' অনুষ্ঠানের পালা। প্রথমে সুপারির,পরে আকন্দ ফুলের মালা বদল করে। পরে বর ও কনে দুজনকেই সিঁদুর খেলাটি খেলতে হয়। বর কলাপাতায় সুপারি,সিঁদুর দেয়। কনে সিঁদুর ঝেড়ে ঝেড়ে রাখে। এরপর কনে সিঁদুর দেয় আর পাত্র সিঁদুর ঝেড়ে রাখে। এভাবে তিনবার খেলাটি খেলতে হয়।

তারপর শুরু হয় 'হস্ত বন্ধন' অনুষ্ঠান। হলুদ কাপড়ে সুপারি,ধান প্রভৃতি বাঁধা থাকে। সেটি দিয়ে বর ও কনের গাঁট বাঁধা হয়। বর কনের মাথায় জাঁতি দিয়ে সিঁদুর দান করে। ভাসুর তিনবার ঘোমটা খুলে দেয়,কনে তিনবার ঘোমটা ঢাকা নেয়। মা,কাকিমারা কনের কোলে পড়ে যাওয়া সিঁদুর পুনরায় কনের মাথায় লাগায়।

এরপর বর ও কনেকে নিয়ে ছামানি ভাঁড় নাড়ানোর খেলা চলে। ছাদ্না তলায় বর ভাঁড়ের ঢাকনা খুলে ধান নেড়ে দেয়। আর কনে সেই ভাঁড় ঢাকা দিয়ে দিয়ে যায়।সকালে বাঁদানি বসে। বাড়ির সবাই বর-কনেকে ধান,দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করে। এইসময় টাকা –পয়সা দান করে থাকে। বর ও কনের মিষ্টিমুখ করানো হয়। কনে মায়ের বুকের দুধ খায়।

এবার রয়েছে কনের বিদায় লগ্নের পালা। বিদায়ের সময় কনেকে বর ধরে থাকে। কনে ঘরের ভিতর চাল ছুঁড়ে দেয়। পেছন দিকে মা, কাকিমা আঁচল পেতে সেই চাল নিয়ে ঘরে চলে যায়। এরপর বর ও কনে গাড়িতে চেপে বরের বাড়ির দিকে রওনা হয়।

বরের বাড়িতে ছাদ্না তলায় জল ছিটিয়ে বর-বধূকে বরণ করে ঘরে ঢুকতে দেওয়া হয়। শাশুড়ি নড়ায় করে বধূর গাল সেঁকে। বধূর চারপাশে এয়োস্ত্রীরা সাততী ঘোরে ও চিমটি কাটে। শাশুড়ি নতুন বউয়ের মুখ দেখে সোনার গয়না উপহার দেয়। কোলে করে বধূকে ঘরে তোলে। এইভাবে আটদিন পর্যন্ত চলে বর-কনের বাড়িতে বিয়ের লোকাচার।

সামাজিক রীতিনীতি : এদের সমাজে রয়েছে অজস্র সামাজিক রীতিনীতি।

১. বাগদি জাতিগোষ্ঠীর জ্যেষ্ঠপুত্র সম্পত্তি ভাগের সময় কিছুটা বেশি অংশ পায় যাতে তার তত্ত্বাবধানে মহিলাদের ভরণ-পোষণ সহজে করতে পারে।

২. বিয়েতে মামারা পিতলের বাসনপত্র যৌতুক হিসাবে দেয়।

৩. কোনো স্ত্রীর সন্তান না হলে কিংবা স্বামীর অনুগত না হলে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটানো হয়। ঐ জাতির বয়োজ্যেষ্ঠরা সভা ডেকে সিদ্ধান্ত নেন। এক্ষেত্রে স্বামী এক খণ্ড খড়কে দু-টুকরো করে দেয় অথবা মেয়ের বাঁ হাতের বালা বা লোহার নোয়া খুলে নেয়। বিবাহ-বিচ্ছেদ হবার পর থেকে ছ' মাস পর্যন্ত স্বামী তার স্ত্রীকে ভরণ- পোষণের খরচ দেয়।

সমাজ অনুশাসন পদ্ধতি : পারিবারিক সমস্যা সমাধান, কেউ অন্যায় আচরণ করলে গ্রামের মোড়ল সভা ডেকে বিচার করতেন। বর্তমানে সমাজ শাসনের ভার প্রধানের ওপর ন্যস্ত। সুবিচারের আশায় থানা, কোর্ট-কাছারিতে ছুটে যায়।

কুলচিহ্ন বা টোটেম : বাউরি জাতির মতো বাগদি জাতির কুলচিহ্ন হল কাশবক। পঙ্কঋষি গোত্রের চিহ্ন বনমোরগ, শালঋষির শোলমাছ, পাত্রিশির কড়াইশুটি ও কচ্ছপ।

নিষেধাজ্ঞা বা ট্যাবু : গোত্রের প্রতীক বস্তু ও প্রাণী যেগুলি গোত্রের অন্তর্গত সেগুলি বাগদিদের কাছে নিষিদ্ধ। তারা সেই সব বস্তু বা প্রাণীদের ছোঁবে না ও খাবেও না।

গোত্র	ট্যাবু
কাশবক বাগদি	বক মারবে না, খাবেও না
পাত্রিশি	বীন,কড়াইশুঁটি ও কচ্ছপ
পনকৃষি	বনমোরগ
শালঋষি	শোলমাছ

আড়স্য গোত্রধারী বাগদি আড়মাছ খায় না।

লোক উৎসব : বাগদি জাতির প্রধান লোকউৎসব হল মনসা পরব। শিব গাজন ও মনসা পরব এদের উল্লেখযোগ্য উৎসব।ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে বাগদিরাও ভাদু পরব অত্যন্ত ধুমধামের সঙ্গে উদযাপন করে থাকে।

ভাষা : বাগদি জাতির মানুষ 'মানভুঁইয়া' ভাষায় কথা বলে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারা : অর্থনৈতিক দিক থেকে এরা পিছিয়ে পড়া জাতি। প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে এদের নাভিশ্বাস ওঠে। সংসার সামলাতে না পেরে ভিনদেশে কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। নিজেদের জীবিকা ছেড়ে অন্য আয়ের পথ তাদের খুঁজে নিতে হয়। এই জাতির আয়ের পথকে সুগম করার জন্য সরকার অনেকগুলি প্রকল্প গড়ে তুলেছে।

৫. ভুঁইয়া

২০১১ সালের সেনসাস রিপোর্ট অনুযায়ী পুরুলিয়ায় প্রায় সাড়ে ঊনত্রিশ হাজার ভুঁইয়া জাতির মানুষের বসবাস। এই জাতির মানুষদের বৃহৎ অংশ গ্রামেই বসবাস করে। যেমন- ভাঙ্গড়া, বড়াসিনি প্রভৃতি গ্রামে গ্রামে এদের বসবাস সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে। শহরে বসতি গড়ে তুলেছে খুব কম সংখ্যক।

নৃতাত্ত্বিক পরিচয় : ডালটন তাঁর 'Ethnology of Bengal' গ্রন্থে বলেছেন ভুঁইয়ারা আসলে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্গত। সিংভূম-এর দক্ষিণে ভুঁইয়ারা নিজেদের বলে ' পবন বংশ' অর্থাৎ ' বায়ুপুত্র'। মনে করা হয় সংস্কৃত 'ভূমি' থেকে 'ভুঁইয়া' নামটি এসেছে। অর্থাৎ ভূমি সংক্রান্ত ব্যাপারের সঙ্গে ভুঁইয়া শব্দটি যুক্ত। মানভূম জেলায় 'ভুঁইয়া' শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়-১) ভুঁইয়া জাতি, ২) ভুঁইয়া পদবি হিসাবে।

চেহারার বৈচিত্র্য : ভুঁইয়াদের উচ্চতা মাঝারি। পাতলা গড়ন ,নাক ছোটো।এদের গায়ের রঙ কালো।

সামাজিক বিন্যাস : এদের সামাজিক বিন্যাসে রয়েছে উপসম্প্রদায় ,গোত্র ও পদবি প্রভৃতি।

ক. উপসম্প্রদায় : মানভূমে ভুঁইয়াদের উপগোষ্ঠী ছিল কাতরাশ ভুঁইয়া, মুশাহার ভুঁইয়া, ধোরা ভুঁইয়া।

খ.গোত্র : ভুঁইয়াদের গোত্রটি হল চিড়ু।

গ.পদবি : ভুঁইয়াদের পদবি হল রায়, ভুঁইয়া, দাস ইত্যাদি।

বাসস্থান : ভুঁইয়া জাতির বেশিরভাগ লোক গ্রামে বাস করে। তবে পুরুলিয়া শহরের অদূরে দুলমি অঞ্চলে গিয়ে দেখলাম ভুঁইয়া জাতির অনেক লোক একসঙ্গে মিলেমিশে বাস করছে। তাদের বসতি এলাকা সকলের কাছে 'ভুঁইয়া পাড়া'নামে সুপরিচিত।

তাদের ঘর বেশ ছোট ছোট আকৃতির।মাটির ও পাথর দিয়ে তৈরি। খুব বেশি উঁচু নয়। টালি আর খাপরা দিয়ে ছাউনি। ঘরের দরজা ছোট। বাইরের কেউ ঢুকতে গেলে মাথা ঠেকে যায় । ঘরগুলোতে থাকে দুটো কক্ষ। সামনের দাওয়ায় বসার ব্যবস্থা। অনেক সময় ত্রিপল দিয়ে এরা তাঁবু খাটায় । এতে গবাদি পশু-পাখি রাখে। এদের সমাজে যাদের আর্থিক অবস্থা ভালো তারা পাকাবাড়ি নির্মাণ করে বাস করে।

খাদ্যাভ্যাস : এরা ভাত, মাছ, মাংস, ডিম খায় । তবে শাক- সব্জি,গুগলি এদের প্রিয় খাবার । এরা শূয়োরের মাংস খেতে পছন্দ করে। এরা নেশা জাতীয় দ্রব্য হাইড়্যা মদ, ভাঙ, গাঁজা, বিড়ি, সিগারেট ইত্যাদি খায় ।

ব্যবহারিক সামগ্রী : রান্নার জন্য অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি, কড়াই এবং খাওয়া-দাওয়ার জন্য স্টিল ও অ্যালুমিনিয়ামের থালা, বাটি, গ্লাস প্রভৃতি বাসনপত্র ব্যবহার করে থাকে। জল রাখার জন্য এরা ব্যবহার করে প্লাস্টিক বা অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি, কলসি ও বালতি ।

বাঁশ ও বেতের ঝুড়ি, কুলো প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য তাদের ঘরে দেখা যায়। টিনের তোরঙ্গ বা বাক্সের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, জামাকাপড় রাখে ।

সাজ-পোশাক : ভুঁইয়া জাতির মেয়েরা সুতির ছাপা শাড়ি পরে। বৃদ্ধরা পরে ধুতি, ফতুয়া,গেঞ্জি। যুবকরা পরে জিন্সের প্যান্ট, টি-শার্ট । ছোট ছোট মেয়েরা ফ্রক এবং ছেলেরা হাফ প্যান্ট, গেঞ্জি, শার্ট পরে ঘুরে বেড়ায় । বর্তমানে বিবাহিত মেয়েরা সিন্থেটিক শাড়ি পরতে পছন্দ করে ।

প্রসাধন সামগ্রী : বাজারের চলতি সাবান,শ্যাম্পু,স্নো-পাউডার, চুলের ফিতে, ক্লীপ প্রভৃতি ভুঁইয়া সম্প্রদায়ের মেয়েদের পছন্দের প্রসাধন সামগ্রী ।

অলংকার : বেশিরভাগ ভুঁইয়া নারীরা পেতলের গয়না পরেন। তবে এখন বাজারের চলতি ইমিটিশানের গহনাও তারা পরছেন। আর্থিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল নারীরা রূপার অলংকার পরেন ।

জীবিকা : ভুঁইয়াদের জীবিকা ভূমি কেন্দ্রিক । শহরে ভুঁইয়ারা রিক্সা চালায়। তবে অধুনা শহর থেকে রিক্সার চল কমে যাচ্ছে। তাই তাদেরও পেশার পরিবর্তন ঘটছে। কেউ কেউ দিন মজুর খাটে, টোটো চালায়। আর মেয়েরা বাবুদের বাড়িতে বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে ।

ধর্ম : ভুঁইয়ারা সাধারণত হিন্দু ধর্মাবলম্বী হয় । এরা হিন্দু দেব-দেবীর পূজা করে ।

দেব-দেবী : বড়পাহাড়ী, রহিন, ভান সিং হলেন তাদের লৌকিক দেব-দেবী। এছাড়াও তারা মনসা, সরস্বতী, শিবের পূজা করে। খুব নিষ্ঠার সাথে মনসার আরাধনা করে ।

বোড়াম দেবতা হলেন সূর্যদেবের স্বরূপ। বোড়াম বড় দেবতা। তার কোনো প্রতীক নেই। সাদা মোরগ বলি দেওয়া হয়। দাসুম পাট, বামনি পাট ও কৈসোর পাট –এই তিন দেবতা ঝোপে থাকেন। এরা তিন ভাই । এই তিন দেবতার প্রতীক হল নুড়ি। দাসুম রোগের রক্ষা কর্তা । সামাজিকভাবে এদের কাছে পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। আখ্যান যাত্রার দিনে তুলসী বীরের পূজা করে। শূয়োর পোড়ানো হয়ে থাকে ।

লোকবিশ্বাস : ভুঁইয়ারা আত্মায় বিশ্বাস করে। তাদের কাছে দেবতাদের আরাধনার জন্য সোমবার,বুধবার,শুক্রবার শুভ দিন। কোনো সন্তানের নামকরণ করে শুক্রবার দিন। এরা মনে করে মৃত ব্যক্তির আত্মা দশ দিনের দিন ঘরে আসে।

লোকসংস্কার :এদের সমাজে জন্ম,বিবাহ,মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিবিধ লোকসংস্কার রয়েছে। সেগুলি হল-

ক. জন্ম-সংস্কার : শিশু সন্তান জন্মগ্রহণকে কেন্দ্র করে অজস্র সংস্কার চোখে পড়ে। যথা-

১. সন্তান প্রসবের পর ধাইমা এসে নাড়ি কাটতো।

২. চারদিনে প্রসূতিকে 'ঝালভাত' দেওয়া হয়।

৩. প্রতিটি জাতির মতোই শিশু সন্তান জন্মগ্রহণের পর নয়দিন অশৌচ থাকে। নাপিত এসে নয়দিনে মা ও সন্তানের নখ কেটে লরাত অনুষ্ঠান পালন করে।

৪. 'একুশা' অনুষ্ঠান পালন করে একুশ দিনে।

৫. অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানে শিশুর মুখে ভাত দেওয়া হয়। ঐদিন ব্রাহ্মণ ও ভিখিরিদের চাল,পয়সা দান করে।

খ. বিবাহ সংস্কার : এদের সমাজে বিবাহ সংস্কারগুলি হল-

১. স্বগোত্রেই বিবাহ হয়।

২. পাত্রপক্ষের লোকেরা মেয়ের বাড়িতে উপহার নিয়ে যায়।

৩. গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে গান গাইতে দেখা যায়।

৪. এই জাতির মধ্যেও বহু বিবাহ প্রথা রয়েছে। কোনো স্ত্রী সন্তান ধারণে অক্ষম হলে স্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারে।

৫. বিধবারা পুনরায় বিবাহ (সাগাই) করতে পারে। দ্বিতীয়বার বিবাহের জন্য কেউ জোর করে না। মৃত স্বামীর ছোটো ভাইকে বিবাহ করতে পারে। বড় ভাইয়ের সাথে বিবাহ চলে না। বিবাহ বিচ্ছেদ এদের সমাজে অনুমোদিত। স্ত্রী নিষ্ঠুর হলে, স্বামী অবহেলা করলে অথবা উভয়ে কুষ্ঠ কিংবা সন্তানহীনতায় মতো রোগে ভুগলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। বিবাহ বিচ্ছিন্না মহিলারা 'সাগাই' রূপে দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারে।

মৃত্যু-সংস্কার : এদের সমাজে মৃত্যুকেন্দ্রিক সংস্কারগুলি হল-

১.ভুঁইয়ারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী তাই মৃতদেহ দাহ করে।

২.ভুঁইয়াদের কারো দশ দিনে আবার কারো পনেরো দিনে ঘাট হয়।

৩.ভুঁইয়ারা শালকাঠে মৃতব্যক্তির মুখাগ্নি করে। কারো ছেলে না থাকলে মেয়েই মুখাগ্নি করে। তবে তাকে শ্মশানে যেতে দেয় না। সে বাড়ির তুলসী তলাতেই একটি শাল কাঠিতে কাপড় জড়িয়ে ঘিয়ে ডুবিয়ে আগুন জ্বেলে মৃতব্যক্তির মুখাগ্নি করে। তারপর মৃতব্যক্তিকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে দাহকার্য সম্পন্ন করে।

৪. কারো ছেলে বা মেয়ে কেউ না থাকলে গ্রামের পাঁচ জন লোকে মিলে 'পাঁচমুখী আগুন' দেয়।

৫. ত্রিবেণীতে অস্থি বিসর্জন দেয়। হবিষ্যি করে খায়।

৬. ঘাটের দিন নতুন বস্ত্র পরে ঘাটে ওঠে। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে লোকজনদের খাওয়ানোর রীতি আছে।

বিবাহরীতি : বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেলে শুভদিন দেখে আশীর্বাদ অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করা হয়। যে যার সুবিধে মতো আশীর্বাদি অনুষ্ঠান পালন করতে পারে। কেউ দশ দিন আবার কেউ চার মাস আগেও করতে পারে। আশীর্বাদি

অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকেন । ঘরের উঠোনে তুলসী তলায় ঘট পাতা হয়। সেখানে বরপক্ষকে বসায়। কনেকে সাজিয়ে গুজিয়ে বরপক্ষের সামনে নিয়ে আসে। ধান,দূর্বা,কানের দুল বা গলার হার দিয়ে কনেকে আশীর্বাদ করেন। এরপর কনে ঘরের লোকজন পাত্রকে জামা,প্যান্ট, তোয়ালে, সোনার চেন বা আংটি দিয়ে আশীর্বাদ করে আসেন ।

তারপর 'লগন বাঁধা' অনুষ্ঠান হয়। আতপ চাল, হলুদ, পাঁচ রকমের ফল,পাঁচ রকমের ফুল,রূপার গয়না, জামা-কাপড় দিয়ে লগন বাঁধা হয়। কনের জামাইবাবু বা পিসেমশাই বরের বাড়ি থেকে লগন নিয়ে আসেন। লগন ভাঁড়ের গিরা খুলে মেয়েকে আইবুড়ো ভাত খাওয়ানো হয়। ভাত, ডাল, তরকারি, মাছ সহযোগে 'ক্ষীর ভাত' খাওয়ানো হয় । ঐ দিন বর ও কনে উভয়কে আকন্দ ও সুপারির মালা পরানো হয় ।

দেখতে দেখতে বিয়ের দিন চলে আসে। সকাল থেকেই বিয়ের অনুষ্ঠান চলে। ছাদ্না তলায় চারদিকে খুঁটি পোঁতা হয়। মাঝখানেও একটি দণ্ডপোঁতা হয় । সেখানে আমডাল, মহুল ডাল, সিধা ডাল বেঁধে ছাদ্নাতলা তৈরি করা হয় ।

কনের মা একটি থালায় ডিম, আলোচাল, হলুদ, সিঁদুর, কাজল ইত্যাদি দ্রব্য সাজিয়ে পুকুর ঘাটে যায়। সেখানে মাটির ওপর ডিম রাখে । ডিমের গায়ে সিঁদুর,কাজল,হলুদের ফোঁটা দেয় । ঘাট পূজা করে।

মেয়ের বিয়ে হলে ভুঁইয়াদের 'মাঠকাড়ান' অনুষ্ঠান করতে হয়। ডালা,টুপা,সিধা ডাল, লাটাই নিয়ে কনের মা, বউদি, কাকিমা, মামিমা মাঠে যায় । সেখান থেকে মাটি তুলে নিয়ে আসে। এরপর ষষ্ঠী বটতলায় গিয়ে কনের মা ষষ্ঠীপূজা করে। বাড়ির মেয়েরা মিলে কনেকে তেল-হলুদ মাখায়। তারপর বাড়ির মেয়েরা দল বেঁধে জল সাইতে যায়। 'জল সাহা' অনুষ্ঠানের পর বর বা কনেকে স্নান করায়। বিয়ের জন্য তারা তৈরি হয়।

বরের মা, পিসিমা, কাকিমা সবাই বরের আল্ল খান । বরের চারপাশে এয়ো নারীরা হাতে আমের বোঁটায় সলতে নিয়ে সাততী ঘোরেন ।

বর বিয়ে করতে আসার জন্য ধুতি,পাঞ্জাবি, টোপর পরে তৈরি হয়। গাড়িতে চেপে কনের বাড়ির দিকে রওনা দেয়। বর কনের বাড়িতে এসে পৌঁছোয়। ঘরের দুয়ারে কনের মা মিষ্টি, জল খাইয়ে তাকে বরণ করেন। আমপাতায় করে জল ছেটানো হয়। তারপর কনের বাবা বা মামা বা জামাইবাবু বরকে কোলে করে ঘরে নিয়ে আসেন। একটি ঘরে বিশ্রামের জন্য তাদের বসানো হয়। বাড়ির মা, মাসি,কাকিমারা কনের আল্ল খান।

তারপর বরকে ছাদ্না তলায় নিয়ে আসে। সাত জন এয়োস্ত্রী মিলে বরের চারপাশে সাততী ঘোরেন। জামাইদাদা ডালায় করে কনেকে ছাদ্না তলায় নিয়ে আসে। বর ও কনের মাথার ওপর কাপড় ঢাকা থাকে । পান পাতায় মুখ ঢাকা অবস্থায় কনেকে বরের চারপাশে ঘোরানো হয়।

তারপর 'মালাবদল' অনুষ্ঠানটি হয়। প্রথমে সুপারি,পরে আকন্দের মালা বদল হয়। তারপর রজনীগন্ধা ফুলের মালা বদল করে । পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করে। বর ও কনের গাঁট ছড়া বেঁধে দেয়। শনের ওপর সিঁদুর রেখে বর, কনের মাথায় সিঁদুর দান করে। সিঁদুর দান সাধারণত কাউকে দেখতে দেওয়া হয় না। নতুন কাপড় দিয়ে কনের মাথা ঢেকে দেওয়া হয়। এইসময় পুরোহিত,নাপিত উপস্থিত থাকে । পুরোহিত যজ্ঞ করেন । কনের হাতে ছোট একটি কুলায় খৈ দেয়। বর কনেকে পেছন থেকে ধরে রাখে। বর-কনে একসাথে কুলো থেকে খই ছড়ায়। তারপর বর-কনেকে ঘরে এনে বসায় । তাদের মিষ্টি জল খাওয়ায়। শ্যালিকারা জামাইয়ের পা ধোওয়ায়।

দেখতে দেখতে রাত পেরিয়ে যায়। ভোর হয়ে আসে। তারপর বাঁদানি বসে। বর-কনেকে ধান ও দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করে। কিছু টাকা পয়সা দান করে। ছামানি ভাঁড় নাড়ানো খেলা হয়।

বিয়ের আসরের আনন্দ, হাসি-ঠাট্টা-এইসব সুন্দর মুহূর্তগুলি ম্লান হয়ে যায় কনে বিদায় অনুষ্ঠানটির সময়। কনের পেছনে মা আঁচল পেতে দাঁড়িয়ে থাকে। আর কনে এক আঁজলা চাল হাতে নিয়ে পেছন দিকে ছুঁড়ে দেয় মা সেই চাল আঁচলে ধরে বাড়ির মধ্যে ঢুকে যায়। বর-কনে গাড়িতে চাপে। রওনা দেয় শ্বশুরবাড়ির উদ্যেশে।

বরের বাড়িতে বর-বধূ পৌঁছোলে তাদের বরণ করা হয়। হাঁড়ির মধ্যে কাঁটা রেখে লোহা খুঁজতে হয়। বধূ লোহা খুঁজে বরের হাতে দেয়। কনের হাতে সেটি পরিয়ে দেয় । পরে বউ ভাতের আয়োজন করা হয় ।

সামাজিক রীতিনীতি :এদের সমাজের সামাজিক রীতিনীতি গুলি হল-

১.বিজয়া দশমীর পরের দিন পাড়ায় কয়েকটি দল এসে বাড়ি বাড়ি ঘুরে পার্বণী সংগ্রহ করে।

২.ভুঁইয়াদের নিজেদের পুরোহিত আছে।

৩.বিয়েতে কাঁসা, পিতল, স্টিলের বাসনপত্র দেওয়ার চলন আছে। বিয়েতে সোনা-রূপার গয়না দেওয়ার রীতিও চোখে পড়ে ।

সমাজ অনুশাসন পদ্ধতি : গ্রামের সমাজ অনুশাসনের দায়িত্ব থাকে গ্রাম পঞ্চায়েতের ওপর। বয়স্ক ব্যক্তিরা বা 'ষোল আনা'র প্রধান মোড়ল সমাজের বিচার ব্যবস্থার দায়িত্বে থাকেন ।

ট্যাবু বা নিষিদ্ধ : ভুঁইয়ারা সাপের পূজা করে তাই তারা সাপ মারে না। চিড়ু অর্থাৎ কাঠবিড়ালিকে তারা মারে না।

লোক উৎসব : মনসা পূজা পুরুলিয়ার জনপ্রিয় লোকউৎসব। প্রায় সব জাতিই এই উৎসব পালন করে। ভুঁইয়ারাও ব্যতিক্রম নয়। রহিন, শিবের গাজন, ভান সিং,করম,টুসু প্রভৃতি উৎসবে মেতে ওঠে তারা।তবে ভাদু পূজায় এদের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না।

ভাষা : 'মানভুঁইয়া' ভাষায় তারা কথা বলে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারা : জেলার আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে সমাজে ভুঁইয়া জাতির লোকেদের অভাব অনটন নিত্যসঙ্গী। সংসার চালাবার মতো তাদের রোজগার নেই। ফলে তারা দিনমজুরের কাজ পেলে করতে বাধ্য হয়। দিনের শেষে হাতে যা অর্থ পায় তাই দিয়ে তারা কোনক্রমে সংসার চালান । এদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

৬. চর্মকার বা মুচি

ট্রেনের কামরায় 'পালিশ,পালিশ, জুতো পালিশ' ডাক শুনতে আমরা অভ্যস্ত। রাস্তার ধারে,গাছের তলায় মাথা নিচু করে জুতো সেলাই করতে ব্যস্ত লোকটি সকলের নজরে পড়ে। এরা অন্য কেউ নয়,এরা মুচি বলে সকলের কাছে পরিচিত। এদেরকে কেউ অন্য নামেও ডাকে। যেমন- চামার, চর্মকার, মোচি, রবিদাস, রুইদাস, ঋষি প্রভৃতি।

নৃতাত্ত্বিক পরিচয় : মুচি জাতি অন্ত্যজ-সংকর শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। মাঝি / নাবিক ও চণ্ডাল রমণী থেকে উৎপত্তি। চর্ম নিয়ে যারা কাজ করে তাদের চামার বলে। মুচি বা চামারদের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন লোককাহিনি প্রচলিত আছে। ব্রহ্মার মানসপুত্র প্রজাপতিগণ যজ্ঞে পশুর মাংস ও হবিঃ অর্পণ করতেন। যজ্ঞ শেষ হলে তাঁরা পশুটিকে পুনরুজ্জীবিত করতেন । কিন্তু কোনো একদিন তাঁরা পশুটিকে পুনরুজ্জীবিত করতে ব্যর্থ হলেন । কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে

জানতে পারলেন যজ্ঞকারী প্রজাপতির গর্ভবতী স্ত্রী একটুকরো মাংসের খণ্ড লুকিয়ে রেখেছিলেন । তখন তিনি সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেন । কয়েকমাস পর তাঁর স্ত্রী এক সন্তানের জন্ম দেন । সেই সন্তান প্রথম মুচি। মুচি জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে এই লোককাহিনিটি উল্লেখযোগ্য ।

চেহারা বৈচিত্র্য : এদের গায়ের রঙ কালো। উচ্চতা মাঝারি, দেহ সুঠাম। কর্ম তৎপর জাতি ।

সামাজিক বিন্যাস : মুচি সম্প্রদায়ের সামাজিক বিন্যাস পরিলক্ষিত হয় । যেমন-

ক. উপসম্প্রদায় : মুচিদের মূলত দুটি উপবিভাগ আছে । যেমন- বড়ভাগিয়া, ছোটভাগিয়া। বড়ভাগিয়ারা কৃষিকাজ করে । ছোটোভাগিয়ারা চামড়ার কাজ করে। চামাররা কাঁচা চামড়ার কাজ করে আর মুচিরা শুকনো চামড়ার কাজ করে।

খ. গোত্র : এরা কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, নাগ গোত্রের হয়।

গ. পদবি :এরা সাধারণত দাস, রুহিদাস, রুইদাস ইত্যাদি পদবি ব্যবহার করে।

বাসস্থান : পুরুলিয়ার গ্রামাঞ্চলে এই জাতির বেশিরভাগ লোক বাস করে। জীবিকার সন্ধানে এসে বিভিন্ন শহরের উপকণ্ঠে এরা বসতি গড়ে তুলেছে। এদের ঘরগুলো মাটির তৈরি। ঘরগুলো নিচু প্রকৃতির । টালি, খাপরা আর খড় দিয়ে ছাউনি । ছাউনির নিচে জানালার বদলে ছোট ছোট ঘুলঘুলি থাকে। ঘরের ভেতর থাকে ছোট ছোট কুঠুরি। এদের ঘরের চালে চামড়া শুকাতে দেখা যায়।

খাদ্যাভ্যাস : মুচি সম্প্রদায়ের নর-নারীরা ভাত ও রুটি খায়। চিঁড়া, মুড়ি, ডাল, শাক-সব্জি, মাছ, মাংস, ফলমূল খায় । চামাররা বাসি মাংস খেলেও মুচিরা তা খায় না।এরা হাঁস, মুরগি পালন করে বলে তাদের মাংস সহজলভ্য । সেইজন্য হাঁস, মুরগির মাংস খেতে এরা বেশি ভালবাসে । এরা হাইড়্যা ও মহুয়া মদের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে ।

ব্যবহারিক সামগ্রী : মুচিদের ঘরে ঘরে দেখা যায় মাটির তৈরি নানা জিনিসপত্র । যেমন-হাঁড়ি, কড়াই, কুঁজো,কলসি ইত্যাদি। রান্নার জন্য এরা ব্যবহার করে হাঁড়ি,কড়াই । খাওয়ার জল রাখে মাটির কলসি বা কুঁজোতে। বর্তমানে মাটির পাত্রের ব্যবহার ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে । তার জায়গায় অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি, কড়াই স্টিলের থালা,বাটি, গেলাস, কলসি ইত্যাদির ব্যবহার বাড়ছে।

সাজ-পোশাক : এই জাতির বয়স্ক পুরুষেরা গ্রামে যাতে সহজে চলাফেরা করতে পারে তার জন্য হাঁটুর ওপর ধুতি পরে। অন্যরা কাজের সুবিধার জন্য ধুতিকে লুঙ্গির মতো করে পরে। বয়স্ক মহিলারা পরে রঙিন শাড়ি। কিন্তু বিধবারা থান কাপড় জড়িয়ে পরে। ঘরের বউরা সস্তা দামের ছাপা শাড়ি পরতে ভালোবাসে। তবে বাড়ির বাইরে বা কোনো উৎসব-অনুষ্ঠানে যেতে হলে বিবাহিত মেয়েরা জরি, চুমকি দেওয়া ঝকঝকে শাড়ি পরে থাকে।

প্রসাধন সামগ্রী : মুচি মেয়েরা একটু বেশি সাজগোজ করতে ভলোবাসে। ক্লীপ, রঙিন ফিতে দিয়ে বাঁধে চুল । তৈরি করে রকমারি খোঁপা। মুখে লাগায় ক্রীম ও পাউডার। চোখে দেয় কাজল। কপালে পরে টিপ।ঘরের কুলুঙ্গিতে রাখা থাকে তেল,শ্যাম্পু,সাবান -যা বাড়ির সবাই ব্যবহার করে থাকে। হাতে মেহেন্দি পরে ।

অলংকার : এদের সমাজের মেয়েদের গয়না পরার শখ আছে ষোলআনা কিন্তু সাধ্য নেই এক আনা। তাই সোনার চেয়ে রূপার গয়না বেশি ব্যবহার করে থাকে। বিবাহ উপলক্ষে রূপোর গয়না কেনার ধুম পড়ে যায়। অনেকে ইমিটিশানের গয়না কেনে । কেউ কেনে কাঁচ বা মেটালের রঙিন চুড়ি। এইসব চুড়ি এরা হাতে পরে রূপ-লাবণ্যকে ফুটিয়ে তোলে।

জীবিকা : চামাররা মৃত পশুর কাঁচা চামড়া নিয়ে কাজ করে। কাঁচা চামড়াকে সংস্কার করে পাকা করে। মুচিরা শুকনো বা পাকা চামড়ার কাজ করে। পাকা চামড়া থেকে বিভিন্ন ধরনের চামড়াজাত দ্রব্য ব্যাগ, সুটকেস,বেল্ট ইত্যাদি বানায়। এরা অনেক শূয়োর চাষ করে। শূয়োরের চামড়া ঘরের চালায় শুকোতে দেয়। সেই চামড়া ট্যানিং করে। এরা জুতো তৈরির কারিগর । এরা শিল্পীর জাত ।

ধর্ম : চর্মকাররা হিন্দু ধর্মাবলম্বী। তবে এদের বেশিরভাগ লোক বৈষ্ণব ধর্মের রীতিনীতি মেনে চলেন ।

দেব-দেবী : বিপদত্তারিণী চণ্ডী হল মুচিদের প্রধান দেবী। আবার কেউ তুলসী তলায় সিজ গাছ পূজা করে। মনসা, শীতলা,শিব ইত্যাদি তাদের লৌকিক দেব-দেবী। মুচি সম্প্রদায়ের লোকেরা বিভিন্ন গ্রাম দেবতার উপাসক হন ।

লোকবিশ্বাস : এদের সমাজে বিবিধ লোকবিশ্বাস রয়েছে। যথা-

১.গ্রামে থাকাকালীন নানা অপদেবতার বিচিত্র কাহিনি তারা শুনতে পায়। এই জাতির লোকেরা সেগুলোকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। অন্য জাতির লোকেদের মতো তারাও ডাইনি, ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করে।

২.সাপে কাটলে তারা ওঝার কাছে ছুটে যায় ।

৩.নাগ গোত্রের মুচি মেয়েরা শঙ্খ নির্মিত শাঁখা পরে না। তারা বিশ্বাস করে এই শাঁখা পরলে অমঙ্গল হবে।

৪.শিশুর জন্মমুহূর্তে ঘরের চালায় পাথর ছুঁড়ে শব্দ করার রীতি ছিল, তাদের বিশ্বাস ছিল এর ফলে শিশুরা সাহসী হবে।

৫.এখন বেশিরভাগ শিশু হাসপাতালে জন্মায় তাই এই রীতি ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

লোকসংস্কার : এদের সমাজে ছড়িয়ে রয়েছে নানা লোকসংস্কার । যেমন-

ক. জন্ম-সংস্কার :শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর এরা অজস্র সংস্কার মেনে চলে । যথা-

১.শিশু জন্মাবার পর ধাইমা এসে শিশুর নাড়ি কেটে তা মাটিতে পুঁতে দিতো। শিশুকে কুলকাঠের আগুনে সেঁক দিতো।

২.সন্তান জন্মানোর পর একদিন প্রসূতিকে অনাহারে থাকতে হয়।

৩.পাঁচ দিনের দিন মাছ বাড়ার দিনে প্রসূতিকে 'চোরা ভাত' খেতে দেয়। প্রসূতি সেই ভাত খাটের তলায় লুকিয়ে খায়।

৪.কেউ পাঁচ দিনের দিন আবার কেউ একুশার দিনে শিশুর নামকরণ করে ।

৫. ন'দিনের দিন হয় 'লরাত' । ওই দিন নাপিত এসে বাড়ির সকলের নখ ও চুল কাটে। পুরুষদের দাঁড়ি কামায়। অশৌচ পালন শেষ হয়। ধোবাকে জামাকাপড় কাচতে দেয়। শিশুকে তেল-হলুদ মাখায়। মেয়েরা পুকুরে স্নান করে।

৬.শিশু জন্মগ্রহণ করবার পর দশ দিন পর্যন্ত প্রসূতির অশৌচ চলে। দশদিন পর স্নান করে অশৌচ কাটে । পুরানো রান্নার বাসনপত্র ফেলে দেয়। নতুন বাসন পত্র এনে ভোজের আয়োজন করে। একে বলে ' বারহিয়া'। তারপর পুনরায় গৃহস্থালির কাজকর্ম শুরু হয়।

৭. কেউ ন'দিনে কেউ একুশ দিনে ষষ্ঠী বটতলায় পূজা দেয়। ধাইমা, প্রসূতি ও অন্যান্য মেয়েরা ষষ্ঠী বটতলায় যায়। সেখানে প্রসূতি চিঁড়া,গুড়,পিঠা দিয়ে ষষ্ঠী বটতলায় পূজা করে। ষষ্ঠীতলায় দুধ ভরায় অর্থাৎ বুকের দুধ দান করে। জাঁতি দিয়ে মাটি খোঁড়ে। কারো ঝারা বারা থাকলে সে ঘর থেকে মাথায় ফুটো কলসি নিয়ে চলে। জল তার মাথা বেয়ে পড়তে থাকে। এভাবে তাকে ষষ্ঠী তলা পর্যন্ত যেতে হয়। ধাইমা এসব কাজে অংশ গ্রহণ করে না । প্রসূতি আলতা ও সিঁদুর পরে।

৮. একুশার দিনে মা ষষ্ঠীকে একুশটি পিঠা দিতে হয়। শিশুকে কাজল দেয়। শিশুকে সোনা হার বা আংটি দেয় । সাপের আঁচুড়, কাঁটা, ঢেলা দিয়ে শিশুটিকে মাছবাড়া দেয়। পূর্বে এরা শিশুকে ছাগল দুধ খাওয়াতো ।

৯.এদের সমাজে অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান আছে । মামাবাড়ির লোকেরা এসে শিশুকে ভাত খাওয়ায় । নতুন জামা, প্যান্ট, তোয়ালে, থালা, বাটি, গ্লাস দিয়ে শিশুকে আশীর্বাদ করে।

বিবাহ-সংস্কার : মুচি সমাজে রয়েছে বিবাহ কেন্দ্রিক অসংখ্য সংস্কার। যেমন-

১. মুচি সমাজে বাল্যবিবাহ পুরোপুরি বন্ধ না হলেও সচরাচর তা চোখে পড়ে না । বিধবারা পুনরায় বিবাহ করতে পারে। বড় ভাই সন্তানহীন অবস্থায় মারা গেলে ছোট ভাই এক বছর বা দেড় বছরের মধ্যে বিধবা বউদিকে বিবাহ করতে পারে। আবার বিধবা হয়ে সে বাপের বাড়িতে ফিরে অন্য কাউকেও বিবাহ করতে পারে। প্রথম স্বামীর সন্তান থাকলেও বিধবা স্বামীর ছোট ভাইকে বিবাহ করতে পারে।

২. বিয়ের কথাবার্তার জন্য পাত্রপক্ষের বাড়ির লোক পাত্রীপক্ষের বাড়িতে উপস্থিত হয়। বিয়ের কথাবার্তা পাকা হলে বিয়ের দিন ঠিক করা হয়। ভালো দিন দেখে তারা আশীর্বাদি অনুষ্ঠান সেরে ফেলে।

৩. প্রথমে ছেলের বাড়িতে আশীর্বাদ অনুষ্ঠানটি হয়। ঠাকুর থানে অর্থাৎ তুলসী তলায় পাত্রীপক্ষকে বসায়। সেই স্থানে চক দিয়ে এঁকে তার ওপর ঘট রেখে আমপাতা দিয়ে আরতি করে । পাত্রীপক্ষ ঘড়ি, রূপার হার বা আংটি, ধুতি, গেঞ্জি, প্যান্ট, তোয়ালে প্রভৃতি সামগ্রী পাত্রের হাতে ধরিয়ে দেয় । সে ওই ধুতি, গেঞ্জি পরে জলপূর্ণ ঘটি হাতে নিয়ে তুলসীতলায় এসে উপস্থিত হয়।

৪. পাত্রকে পাত্রীপক্ষের লোকেরা তার নাম, বাবার নাম, জ্যেঠার নাম প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করে । তাকে ঠাকুর থানে বসতে বলে । সেখানে একটি কাঁসার থালায় ধান, দূর্বা এবং বাটিতে চন্দন, সুপারি রাখা থাকে। পাত্রীর বাবা, মামা, জ্যাঠা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ পাত্রের মাথায় ধান, দূর্বা এবং পয়সা দিয়ে আশীর্বাদ করে। লাড্ডু দিয়ে মিষ্টিমুখ করায়।

৫. বিয়ের দুদিন আগে পাত্রপক্ষ একইভাবে পাত্রীর বাড়িতে গিয়ে তাকে আমলা-বাসলা, তেল, হলুদ, কাজল, সিঁদুর, শাড়ি, রূপার কোনো অলংকার, প্রসাধনী দ্রব্য প্রভৃতি সামগ্রী দিয়ে আশীর্বাদ করে । কনের আট অঙ্গে তেল-হলুদ ছুঁইয়ে দেয়।

৬. তারপর গুয়াটিকা অনুষ্ঠান হয়। শ্বশুর,ভাসুর,জা প্রভৃতি বয়োজ্যেষ্ঠরা সুপারিতে চন্দন এবং সিঁদুরের টিপ দিয়ে গুয়াটিকা করে এবং সাধ্যমতো মেয়েকে পয়সা,জিনিস দান করে।

৭. উভয়পক্ষের শ্বশুর বা মামা শ্বশুর বা মেসো শ্বশুর, জ্যাঠা,কাকা সকল আত্মীয়বর্গ আশীর্বাদের অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করেন। সাধারণত রাতের বেলা আশীর্বাদি অনুষ্ঠানটি হয়।

৮. আশীর্বাদের পরে সাধারণত তিনদিনের লগন বাঁধা হয়। লগনটি শালপাতায় বাঁধা থাকে। নিষ্ঠার সাথে অত্যন্ত সাবধানে লগন ভাঁড় আনতে হয়। লগন ভাঁড় আনবার সময় রাস্তার কোথাও সেটি নামানো যাবে না। হাঁচি ও কাশি হলে অমঙ্গল হবে এমন সংস্কার এরা মেনে চলে।

৯. কনের বাড়ির লোক তুলসী তলায় আলপনা দেওয়া স্থানে (চোখ এঁকে) লগন ভাঁড়,মিষ্টি রাখে। সেগুলিকে ধূপ দিয়ে পূজা করে ঘরে ঢোকায়।

মৃত্যু-সংস্কার : মানুষের মৃত্যু চিরন্তন সত্য। এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মুচি সমাজে রয়েছে অজস্র সংস্কার। যেমন-

১. মুচি সমাজে মৃতদেহ দাহ করা বা মাটিতে পোঁতা- উভয় প্রকার রীতিই প্রচলিত। সাধারণত বিবাহিতদের পোড়ানো হয় এবং অবিবাহিতদের মাটিতে পোঁতা হয়।

২. মুচিদের ঘরে কেউ মারা গেলে গোবর জল ছড়া দিয়ে মৃতব্যক্তিকে শ্মশানে নিয়ে যায়।

৩.মৃতদেহের মুখে আগুন দেওয়ার জন্য বেল কাঠ লাগে। কেউ কেউ চন্দন কাঠও ব্যবহার করে থাকে।

৪. শব দাহ করার সময় ভাঁড়,খই,পয়সা,ঘি লাগে। মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় খই ছড়াতে থাকে।

৫. শবদাহের পর ভস্মাবশেষ নদী বা পুকুরে ভাসিয়ে দেয়।

৬. তিন দিনের দিন 'তিতান্ন' (তিতাভাত) হয়। ওই দিন পরিবারের সকলকে তেল, খই ছুঁতে হয়।

৭. কুল গোড়ার পাঁড়ে বামুন পুরোহিত যজ্ঞ করে। মৃত ব্যক্তির উদ্যেশে পিণ্ড দান করে। তিল, কলা, যব, খাপরা ভাঙ্গা গুলে পিণ্ড তৈরি করে। সাত দিনের দিন সাতটা পিণ্ড দেয়।

৮. মুখাগ্নিকারী ব্যক্তি হবিষ্যি করে। দশ দিন ধরে হবিষ্যি খেতে হয়। আলোচালের ভাত সৈন্ধব লবণ দিয়ে খায়। খাবার খাওয়ার সময় কোনো পশু-পাখি ডেকে উঠলে সে আর খেতে পারে না। তখন ছোলা ভিজা, ফল-মূল খেয়ে থাকে।

৯. দশ দিনে ঘাট হয়। মুখাগ্নিকারী ব্যক্তি ঘাটের দিন পুকুর ঘাটে ১০টা পলাশ পাতায় আতপচাল আর দুধ দিয়ে পিণ্ড দেয়। তিল পাতে বসে। তুলসীতলায় কলাপাতায় তিল, যব, কলা আরও বারো রকমের জিনিস দিয়ে ১১টা পিণ্ড দান করে।

১০. আগে মৃতের পরিবার অশৌচ বারোদিন ধরে পালন করতো। তেরো দিনের দিন শ্রাদ্ধ হোত। বর্তমানে দশদিন অশৌচ পালন করে এবং এগার দিনে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করে থাকে।

১১. অস্বাভাবিক মৃত্যুতে মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ করা হয় না। তবে পরিবারের সকলকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

বিবাহরীতি : বিয়ের দুদিন আগে কনেকে তেল-হলুদ মাখায়। মেয়ের গায়ে তেল-হলুদ দিলে আর ঘরের বাইরে যেতে পারে না। গায়ে হলুদের দিন ১০১ টি পিঠা কিংবা মিঠাই দিতেই হবে। অনেকে সেইদিন আবার কেউ পরের দিন পাত্র-পাত্রী উভয়কেই আইবুড়ো ভাত খাওয়ায়। উভয়েই মামাবাড়ির থেকে দেওয়া জামা কাপড় পরে মামাবাড়ির

ভাত খায়। মাছ আর নানা রকম তরকারি প্রভৃতি সহযোগে 'ক্ষীর ভাত' খাওয়ানো হয়। সবাই এসে তাদের পয়সা দিয়ে আশীর্বাদ করে।

বিয়ের দিন পাত্র বা পাত্রী,জামাইবাবু,বাড়ির বউরা মিলে আম ডাল,মহুয়া ডাল, সিধা ডাল পুঁতে ছাদ্‌নাতলা তৈরি করে। এরপর মেয়েকে ষষ্ঠী বটতলায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ষষ্ঠীপূজা দেওয়া হয়। ডোম এলে তার ঢাক-ঢোলটাকে প্রদীপ জ্বালিয়ে,শাঁখ বাজিয়ে ধান,দূর্বা দিয়ে চুমানো অর্থাৎ পূজা করা হয়।

কনের বা বরের মা ভোরবেলা ঘাটে গিয়ে পান, সুপারি দিয়ে ঘাটকে নিমন্ত্রণ করে আসে। অনেকে ভোরবেলাতেই অর্থাৎ সূর্য ওঠার আগেই জল সাইতে যায়। পুকুর ঘাটে গিয়ে কনের জামাইবাবু লোহার জিনিস বা দা দিয়ে আছুয়া জল কাটার পর কনের মা হাঁড়িতে জল ভরতে পারে। এরপর শুরু হয় ঘাটপূজা। ডিম, সিঁদুর, কাজল দিয়ে কনের মা ঘাটপূজা করে এবং মুরগির ডিমটি পুকুরে ফেলে দেয় । ডোম সেটি কুড়িয়ে নেয় । এটিই রীতি।

এরপর তিনবার জলের হাঁড়ি বদল করা হয়। মা,মাসিরা বাঁধের ঘাটেই একে অপরকে সিঁদুর দেন। একদিকে সিঁদুর পা্টোয়াসি এবং এক চোখে কাজল পরানো হয়। ছাদ্‌নাতলায় এলে অন্যদিকে পাটোয়াসি এবং অপর চোখে কাজল দিয়ে তা পূর্ণ করা হয়। জলের হাঁড়ি নিয়ে এসে মা,কাকিমা,মাসি সকলে ছাদ্‌না তলায় তিনবার ঘোরে।

বিয়ের দিন বরের স্নানের সময় তার পায়ের গড়িয়ে যাওয়া জল একটা শিশিতে ধরে রেখে কনের বাড়ি পাঠানো হয়। সেই জল স্নানের জলের সাথে মিশিয়ে কনেকে স্নান করায়। এই অনুষ্ঠানটিকে 'তেল চঢ়ান' বলে। ছাদ্‌না তলায় মা, কাকিমা, জেঠিমা, পিসিমা সব নারীরা বরের আল্ল খায় ।

বর ধুতি,পাঞ্জাবি পরে । কপালে চন্দনের ফোঁটা দেয়। মাথায় টোপর পরে বর বেশে সেজে ওঠে। গাড়িতে চেপে বিয়ে করতে যায়। ১০১ টাকা দিলে তবেই বরকে গাড়ি থেকে নামতে দেওয়া হয়। মন্দিরে মাড়না (প্রণামী)১০১ টাকা দিলে তবেই বরকে বিয়ে করতে যাওয়ার জন্য রওনা দিতে পারে । বর, কনে বাড়ির দরজায় পৌঁছালে এক ঘটি জল একটি আম পাতা দিয়ে এক পায়ে দাঁড়িয়ে কন্যার বাবা বা মা প্রার্থনা করতো । তবে বর্তমানে একপায়ে দাঁড়ানো রীতিটির বদল ঘটেছে। বরের বাড়ির লোক অর্থাৎ বাবা বা মামা বা মেসো ঘটির জল ধরলে তবেই বর পক্ষ ঢুকতে পারবে ।

বর, কনেবাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠদের পা ধোওয়ায়। বাড়ির বড়রা অর্থাৎ কনের মা, জেঠিমা ,মাসি,পিসি একটি থালায় ধান,দূর্বা,প্রদীপ নিয়ে বরকে বরণ করে এবং গুড়-জল খাওয়ায়। পান পাতা দিয়ে বরের গাল সেঁকে। তারপর বরকে কোলে করে এনে অন্য ঘরে বসায়।

ছাদ্‌না তলায় মা, মাসি, বউদিরা কনের আল্ল খায় । তারপর পান পাতায় মুখ ঢেকে কনে তিনবার ছাদ্‌না তলায় ঘোরে । নাপিত বিবাহের স্থানের কিছুটা জায়গায় চক দিয়ে প্রস্তুত করে দেয়। বরকে কোলে করে ছাদ্‌না তলায় নিয়ে আসে । সেই স্থানে বরকে বসানো হয়। তিনবার ঘোরার পর কনে বাবা বা মামার কোলে বসে। বর তার বাবা বা কাকার কোলে বা হাঁটুর ওপর বসে। সমাজপতি বা কুলগোড়ার পাঁড়ে বামুন এই বিবাহের পৌরোহিত্য করে। বর ও কনের কব্জিতে আমপাতা বেঁধে দেয়। মন্ত্র পাঠ করে। এরপর দুই বেহাইয়ের মধ্যে গুড়বাটি বদল এবং হাত বন্ধন করা হয়। তারপর বর-কনের হাত বন্ধন হয়। কারো কারো বিয়েতে ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করে।

বিয়ের মূল পর্ব শুরু হয় কাপড় ঢাকা দিয়ে 'মালাবদল' অনুষ্ঠানটির মধ্য দিয়ে। প্রথমে বর ও কনে একে অপরকে সিঁদুর,কাজলের দাগ দেওয়া সাদা কাপড়ের মালা একে অপরকে পরায়। তারপর গুয়া –পৈতার মালা এবং আকন্দ ফুলের মালাবদল করে ।

কোনো মেয়ে কনে থেকে বধূ হয়ে ওঠে সিঁদুর দান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। মুচিদের কনের বাড়িতেই 'সিঁদুর দান' অনুষ্ঠান হয়। বর প্রথমে সোনা দিয়ে, তারপর রূপার টাকা দিয়ে কনের সিঁথিতে সিঁদুর দেয়। সবশেষে শন, সুপারি, পয়সা, পাঁচটি চাল, পাঁচটি দূর্বা ঘাস, সিঁদুর –একসাথে নিয়ে পাঁচ আঙ্গুলে করে কনের সিঁথিতে সিঁদুর ঘষে দেয়। কেউ কেউ ইচ্ছে হলে খই ছড়ানো অনুষ্ঠানটি করে। তবে সাততী ঘোরা নেই। পাত্রীর বাড়িতে ছাদ্না তলায় সিঁদুর দান ও মালা বদলের মধ্য দিয়া বিবাহ কাজ সম্পন্ন হয়।

মুচিদের ঘরে 'কহবর' অনুষ্ঠান হয়। বর পা দিয়ে ধান কুটে আর কনে তখন ডান হাত দিয়ে ধান নাড়ে। আবার কনে যখন পা দিয়ে ধান কুটে বর হাত দিয়ে ধান নাড়ে। ছামানি ভাঁড় নাড়ানো খেলাটিও চলে। এরপর নাপিত বর-কনের পায়ে আলতা পরিয়ে দেয়।বর ও কনেকে একসাথে বসিয়ে 'বান্দাপণ' বা 'বাঁদানি' অনুষ্ঠান হয়। বর ও কনের সামনে রাখা থাকে দুটি থালা। যে যার সাধ্যমতো টাকা-পয়সা দিয়ে বর-বধূকে আশীর্বাদ করে।

বিয়ের পর মেয়ের আর বাপের বাড়িতে থাকা চলে না। তাকে যেতে হয় তার শ্বশুর বাড়ি। তাকে বিদায় জানানোর জন্য 'ঘর ভরা' অনুষ্ঠান হয়। মুচিদের কারো কারো ক্ষেত্রে বর-কনে উভয়কেই ঘর পূরণ করতে হয়। প্রথমে কনে ঘর ভরে। মা আঁচল পেতে কনের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে। বাড়ির অন্যরা কনের হাতে চাল দেয়। সে ঐ চাল পেছনে মায়ের আঁচলে ফেলে দেয়। তাকে প্রশ্ন করে বাড়ির বড়রা- 'বিটি কার ঘর ভরছিস্ ?' সে উত্তর দেয়-' মা-বাপের ঘর ভরছি'। 'কোথা যাছিস বেটা?' সে উত্তর দেয় 'কামিন খাটতে'।এরপর বর 'ঘর ভরা' অনুষ্ঠান করে। তাকে প্রশ্ন করা হয় –'কার ঘর ভরলি?' সে বলে- 'শ্বশুর-শাশুড়ির ঘর ভরছি'। তারপর বরের হাতে কনেকে ধরিয়ে দেয়। এরপর বর-বধূকে বিদায় দেওয়ার পালা।

সামাজিক রীতিনীতি : এদের সমাজের সামাজিক রীতিনীতিগুলি হল-

১. মুচি সমাজে বিয়েতে পণ প্রথার প্রচলন একসময় ছিল। মোটর সাইকেল, টিভি আলমারি ইত্যাদি দেওয়ার জন্য দাবী করে। শুধু তাই নয় মেয়েকে গয়না দিয়ে সাজিয়ে দেওয়ার রীতি রয়েছে।

২. মুচি, চামারদের অনুষ্ঠানে পুরোহিত থাকে না। ডোমদের মতো সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠরা উৎসব-অনুষ্ঠান পরিচালনা করে থাকেন।

৩.মুচি ও চামার এরা ভ্রাতৃদ্বিতীয়া অনুষ্ঠান পালন করে। বোনেরা ভাইদের কপালে লাল চন্দনের ফোঁটা বা টিপ দেয়। ভাইদের মিষ্টি খাওয়ানো হয়। নতুন জামা কাপড় উপহার দেয়।

৪. কেউ অসুস্থ হলে বা ঘরে মহামারী হলে রমণীরা গলায় কলাপাতা বেঁধে ভিক্ষে করতে যেতো। সমাজে চামারদের স্থান খুব নিচে। ব্রাহ্মণদের উচ্ছিষ্ট খাবার এরা গ্রহণ করে না।

৫. জন্ম থেকে বিবাহ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের মধ্যে ষষ্ঠী বটতলায় ষষ্ঠীপূজা করতে হয়। বিয়ের পর আর ষষ্ঠী পূজা করা যায় না। এদের সমাজের লোকেরা এই সংস্কার মেনে চলেন।

সমাজ অনুশাসন পদ্ধতি :মুচি সমাজে অনুশাসন পদ্ধতি পরিচালনা করতে সর্বময় কর্তা হল সমাজপতি। বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েত এদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে থাকে। বিচারের আশায় থানা,কোর্ট কাছারিতে এরা হাজির হয়।

ট্যাবু বা নিষেধাজ্ঞা : নাগ গোত্র যাদের তারা শাঁখা পরে না। কাছিম গোত্ররা কচ্ছপ খায় না।

লোক উৎসব : উৎসব এলে মুচি জাতির লোকেরা আনন্দে মেতে ওঠেন। উৎসবের কেনাকাটা, পূজার্চনায় এরা মশগুল হয়ে থাকে। মনসা পূজায় এরা মনসার গান জাঁতগান গাইতে থাকে।

মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চম দিনে চামারদের প্রধান বার্ষিক উৎসব 'শ্রীপঞ্চমী' মহা ধুমধামের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষে সমস্ত কাজকর্ম ফেলে রেখে আনন্দ স্ফূর্তিতে বিভোর হয়ে ওঠে। ছাগল, হাঁস, মুরগি বলি দেয়।

দশেরার কয়েকদিন আগে চামাইনরা গান গেয়ে ঘুরে বেড়াতো। চাল অথবা টাকা সংগ্রহ করে।

চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের নবম দিনে রামনবমী পালন করে। পান-সুপুরি , মিষ্টান্ন ,ফুল দিয়ে তাদের পূর্ব পুরুষ রবিদাসকে উৎসর্গ করে।

ভাষা : এরা **'**মানভুঁইয়া' ভাষায় কথা বলে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারাঃ- এরা হিন্দু সমাজের অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মানুষ। এরা অস্পৃশ্য। এদের ছোঁওয়া জল অন্য জাতির লোকেরা কেউ খায় না। ফলে এরা সমাজে ব্রাত্য। এদের আয়ের উৎস সীমিত। দুঃখ-দারিদ্র্যে মধ্য দিয়ে এদের দিন কাটে। এদের সামাজিক আচার-আচরণ ডোমদের মতো। এরা নিজেদের ডোম জাতির চেয়ে উচ্চতর শ্রেণি বলে মনে করে। এরা চামড়ার ব্যাবসা করে। কেউ কেউ জুতোর দোকান খুলে বসেন। কেউ বা জুতো পালিশের কাজ করেন। এভাবেই অর্থ উপার্জন করে দিন কাটে। কেউ বা দিন মজুরের কাজ করে দিনাতিপাত করে।

৭. ধোবা, ধোবি

পুকুর ধারে মাঠের মাঝে চোখে পড়ে কতকগুলো দড়ির লম্বা লম্বা সারি। সেগুলোতে ঝুলে থাকে জামা প্যান্ট, ধুতি, চাদর ইত্যাদি নানা রঙ-বেরঙের পোশাক। সেগুলোকে কাচার পর রোদে শুকাতে দিয়েছে। এতেই মনে পড়বে এটি ধোবার কাজ। সমাজের নানা সম্প্রদায়ের অপরিষ্কার বা ময়লা জামা কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার করে তারা ধোপা, ধোবা, ধোবি, রজক নামে পরিচিত। পুরুলিয়া জেলার ধোবিদের সংখ্যাও কম নয়। প্রায় চব্বিশ হাজারের কাছাকাছি এদের জনসংখ্যা। শিং বাজার, চিড়ুগোড়া,ধোবাডি, বুরদা প্রভৃতি গ্রামে এই জাতির বসবাস সবচেয়ে চোখে পড়ে।

নৃতাত্ত্বিক পরিচয় : ধোবা জাতি মধ্যম সংকর। ধোবা জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে দুটি লোককাহিনি এখানকার লোকসমাজে প্রচলিত আছে। যেমন-

১) নেতা মুনি বা নেতু ধোপানি থেকে উৎপত্তি। ব্রহ্মার বস্ত্র পরিষ্কার করতো নেতু ধোপানি।

২) নেতা ছিল ধোবা মুনি নামে এক ভক্তের ছেলে ,যে নদীতে তার কৌপিন ধৌত করতো। কৌপিন পরিষ্কার করতে গিয়ে সে ক্লান্ত হয়ে পড়তো। তার ফলে সে সময়মতো ফুল তুলে আনতে পারতো না। এই অবহেলার জন্য অন্য ভক্তরা তাঁকে অভিশাপ দেয় যে সে এবং তার পরবর্তী বংশধরেরা ময়লা জামা-কাপড় পরিষ্কার করতে থাকবে। এই লোককাহিনির কথা এখনও এরা বিশ্বাস করেন।

চেহারা বৈচিত্র্য : এদের গায়ের রং কালো। উচ্চতা মাঝারি। সুঠাম ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়।

সামাজিক বিন্যাস : এদের সামাজিক বিন্যাসের মধ্যে রয়েছে উপসম্প্রদায়, গোত্র, পদবি ইত্যাদি।

ক. উপসম্প্রদায় : ধোবাদের দুটি বিভাগের কথা জানা যায়- ১) রামের ধোবা, ২) সীতার ধোবা।
রামের ধোবা পুরুষদের এবং সীতার ধোবা মহিলাদের পোশাক পরিষ্কার করতো।

খ. গোত্র : শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, আলম্যান।

গ. পদবি : এদের পদবিগুলি হল –রজক, দাস, মিস্ত্রী প্রভৃতি।

বাসস্থান : ধোবারা গ্রামাঞ্চলে মাটির বাড়িতে বাস করে। বাড়িগুলোর উচ্চতা মাঝারি ধরনের। খড় বিশেষ জোগাড় করতে পারে না বলে ছাউনি দিতে টালি ও খাপরা ব্যবহার করে। ঘরগুলির ছোট ছোট জানালা। চোরের হাত থেকে বাঁচার জন্য জানালাগুলো উপরের দিকে বানায়।

খাদ্যাভ্যাস : এরা দু'বেলা ভাত খেতে অভ্যস্ত। ভাতের সঙ্গে থাকে অড়হর ডাল আর শাক-সব্জি। মাছ, মাংস, ডিম রান্না করে খায়। কোনো কোনো দিন এরা গুগলি রান্না করে খায়। মণ্ডা, মিঠাই,জিলাপি প্রভৃতি মিষ্টান্ন দ্রব্য খেতে ভালোবাসেন।

ব্যবহারিক সামগ্রী : এরা রান্না করতো মাটির হাঁড়িতে। জল রাখত মাটির কলসিতে। কাচা সাদা জামাকাপড়গুলোকে নীল রঙের জলে চোবানোর জন্য মাটির বা অ্যালুমিনিয়ামের বড় গামলা ব্যবহার করতো। এখনও এসব সামগ্রী এরা ব্যবহার করে থাকে। বর্তমানে রান্নার কাজে অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি,কড়াই,ডেকচি ইত্যাদি জিনিস লাগে। স্টিলের কলসি আর বালতিতে জল রাখে। এখন রঙ চোবানোর জন্য প্লাস্টিকের বা স্টিলের গামলা ব্যবহার করছে। কাপড় কাচার জন্য পাটাতন ,মুগুর ব্যবহার করতে দেখা যায়। কয়লার উনুনে লোহার ইস্ত্রি গরম করে জামাকাপড় ইস্ত্রি করে।

সাজ-পোশাক : এদের সমাজে বয়স্ক পুরুষেরা পরেছে খাটো ধুতি আর ফতুয়া। কাপড় কাচার সময় কেউ গামছা বা খাটো ধুতি পরে থাকে। কেউ কেউ ধুতিকে লুঙ্গির মতো করে পরিধান করে থাকে। ধোবা জাতির মেয়েরা আটপৌরে সুতির শাড়ি পরে থাকে। সুতির কাপড় ভারী পছন্দের। শীতকালে মোটা চাদর,উলের সোয়েটার ব্যবহার করে। আর শীতের রাত্রে এরা লেপ,কাঁথা, কম্বল গায়ে দেয়।

প্রসাধন সামগ্রী : এই জাতির মেয়েরা সাজগোজ করতে খুব ভালোবাসে। মুখে মাখার ক্রিম ও পাউডার ব্যবহার করে। ঠোঁটে লাগায় লিপস্টিক। চোখে পরে কাজল। নানা ধরনের ক্লীপ দিয়ে চুল বাঁধে। শ্যাম্পু দিয়ে চুল পরিষ্কার করে। মাথায় সুগন্ধি তেল মাখে। মেয়েরা হলুদ,চন্দন বেটে মুখে লাগায়।

অলংকার : এরা সোনা-রূপোর গয়না পরতে ভালোবাসে। এই জাতির মেয়েরা গলায় রূপোর হার, পায়ে রূপোর চুটকি, হাতে রূপার আংটি পরে। এই জাতির বয়স্ক মহিলারাও রূপোর গয়না পরার লোভ ছাড়তে পারে না। এমনকি ইমিটেশানের গয়না পরে মনের সাধ মেটায়। যুবতী মেয়েরা পাথর বসানো হার, কানের দুল পরতে ভালোবাসে।
বাজারের চলতি ইমিটিশানের, কাঁচের চুড়ি ব্যবহার করে। কেউ কেউ কানে বড় বড় ঝুমকোপাশা পরে। বয়স্ক মহিলারাও হাতে দু গাছা ইমিটিশান বা রূপার চুড়ি পরে। গলায় পরে হার।

জীবিকা : বংশ পরম্পরা ধরে ধোবাদের জীবিকা কাপড় কাচা ও কাপড় পরিষ্কার করা।এখনও একাজ এদের সমাজের নর-নারীরা গ্রামে গ্রামে করে থাকে। তাই গ্রামের ধোবা তাদের কাজের জন্য ' চাকরান' জমি লাভ করে। বর্তমানে বৃত্তির পরিবর্তন ঘটেছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ চাষবাস করেন। কেউ কেউ গোরুর গাড়ি চালায়,কেউ কেউ দুধ বিক্রয় করে। পড়াশুনা করে শিক্ষিত হয়ে ডাক্তার,ইঞ্জিনিয়ারও হচ্ছে সে দৃষ্টান্তও কম নয়।

ধর্ম : বেশিরভাগ ধোবা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত। কেউ কেউ শাক্ত ধর্মাবলম্বী।

দেব-দেবী : ধোবাদের কুলদেবী হলেন মনসা। সাধারণত এরা শীতলা, ভাদু, টুসু, শিব, চণ্ডীর আরাধনা করে।

লোকবিশ্বাস : ধোবা সমাজের লোকেরা ডাইনি, হাওয়া লাগা, নিশি পাওয়া, নজর লাগা প্রভৃতি বিষয়গুলিকে এখনও বিশ্বাস করে থাকে।

লোকসংস্কার : এদের সমাজে জন্ম,বিবাহ,মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিবিধ লোকসংস্কার চোখে পড়ে। সেগুলি হল-

ক. জন্ম-সংস্কার : শিশুর জন্ম সংক্রান্ত সংস্কারগুলি হল-

১.বাড়িতে সন্তান প্রসব করলে হাড়ি এসে নাড়ি কাটে।

২. প্রসূতিকে চার দিনের দিন 'ঝালভাত' খাওয়ানো হয়।

৩. কেউ কেউ পাঁচ দিন,ছয় দিনে,নয় দিনে 'নারতা' অনুষ্ঠান করে। ঐ দিন শিশুকে তেল-হলুদ মাখায়।

৪. বাঁধের ঘাটে গিয়ে প্রসূতি পূজা করে। ডিম বা গুঁড়ি,সিঁদুর,তেল,মায়ের বুকের দুধ দিয়ে পূজা করে। পূজার পর উপকরণসমেত জলে বিসর্জন দেয়।

৫. একুশ দিনে 'একুশা' করে। কেউ কেউ ঐদিন সন্তানের নামকরণ অনুষ্ঠানও করে।

৬. ছয় মাস বা সাত মাসে 'মুখেভাত' অনুষ্ঠানে শিশু নিজের বাড়ির ভাত খায়। অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানটি ছেলেদের ক্ষেত্রে সাত মাসে হয়।

খ. বিবাহ-সংস্কার : এদের সমাজে জন্ম কেন্দ্রিক যেমন অজস্র সংস্কার রয়েছে তেমনি বিবাহকে কেন্দ্র করে রয়েছে নানা সংস্কার। যথা-

১. ধোবা সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। মেয়েদের বয়স সাত থেকে নয় বছর হলে তাদের বিয়ে দেওয়া হোত। ছেলেদের বয়স এগারো থেকে পনেরো হলে বিবাহ দেওয়া হোত।

২. ধোবাদের বিয়েতে ব্রাহ্মণ সমাজের পুরোহিত থাকে না । কেউ ইচ্ছে করলে ব্রাহ্মণকে দিয়ে অনুষ্ঠান করায়।

৩. গ্রামের পাঁচজন কুটুম্বকে দিয়ে আশীর্বাদি অনুষ্ঠান সেরে নেয়।

৪. তুলসী তলায় চোখ এঁকে অর্থাৎ আলপনা এঁকে সেই স্থানে আশীর্বাদের থালা রাখা হয় । পাত্রপক্ষ ধান, দূর্বা, আতপ চাল দিয়ে পাত্রীকে আশীর্বাদ করে। পাত্রকেও আশীর্বাদ করতে হয় –এটাই নিয়ম ।

৫. একটি নতুন গামছায় আতপ চাল, হলুদ,সুপারি,মিঠাই,আমপাতা শন দিয়ে লগন বাঁধা হয়। জামাইবাবু লগন বাঁধেন । বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত জামাইবাবু বর বা কনের সাথে সাথে থাকে।

৬. লগন ভাঁড়ের গিঁট খুলে বর ও কনেকে নিজের নিজের বাড়িতে ক্ষীর ভাত বা পায়েস, মাছ-তরকারি দিয়ে আইবুড়ো ভাত খাওয়ানোর রীতি আছে ।

৭. বিয়ের দিন জলসাইতে যায় বাড়ির মা,মাসি,কাকিমারা। বাঁধের ঘাটে গিয়ে দুটি জায়গায় গুঁড়ি দিয়ে আলপনা দেয় । তার ওপর দুটি হাঁড়ি বসায়। হাঁড়ি গুলো সাজায়। আলপনা গুলো তুলে জলে দেয়। হাঁড়িগুলোতে জল ভরে কাঁখে করে নতুন কাপড় ঢাকা দিয়ে তারা ঘরে নিয়ে আসে।

৮. 'ঘি ঢালি' অনুষ্ঠান হয়। ডোম এসে বাজনা বাজায়। নাপিতরা মেয়েদের আলতা পরায়।

৯. বর আম গাছকে বিয়ে করে। কনের সাথে মহুল গাছের বিয়ে দেয় ।

মৃত্যু-সংস্কার : এদের সমাজের মৃত্যু-সংস্কারগুলি হল-

১. মৃতদেহ দাহ করা হয়।

২. শ্মশানে অনেকে শাল কাঠে বা যে কোনো কাঠে আগুন দেয়।

৩. দশ দিনে ঘাট হয়। এদের পারলৌকিক ক্রিয়া তেরো দিনে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

৪. তবে বর্তমানে এগার দিনে শ্রাদ্ধ হয়। পুকুর ঘাটে পিণ্ড দেওয়ার সময় অজস্র সংস্কার চোখে পড়ে।

বিবাহরীতি : বর সেজেগুজে টোপর পরে কনে বাড়িতে আসে। শালপাতায় জল ঘটি সমেত 'আজ্ঞা' নিয়ে কনের বাবা, মা সকলেই বের হয় ।বরকে ধান, দূর্বা দিয়ে বরণ করে। মিষ্টি-জল খাওয়ায়। ঘটিটি বরের কুটুম্বদের হাতে দিয়ে বরকে কনের বাবা বা জামাইদাদা হাতে করে ধরে ঘরে প্রবেশ করে। প্রথমে বরকে অন্য ঘরে বসতে দেওয়া হয়।

মা, কাকিমারা কনের আম্ল খায়। খাচ্ছাড়ি করে। তারপর ছাদ্না তলায় বরকে এনে হাজির করে। কনেকে সাজিয়ে মাথায় কাপড় ঢাকা দিয়ে বাচা ডালিতে করে নিয়ে আসে। ছাদ্না তলায় মেয়েকে ঘোরানো হয়। তারপর বিয়ের পালা। বর ও কনে একে অপরের মালা বদল করে। প্রথমে আকন্দ ও পরে সুপারির মালাবদল করে। বর কনের মাঝখানে একটি কাপড় দিয়ে আড়াল করা থাকে। বর শনের ওপর সিঁদুর ঢালে। তারপর কাপড়ের নিচ দিয়ে মেয়ের মাথায় শন দিয়ে সিঁদুর ঘষে দেয়।

সিঁদুর দান হয়ে গেলে বর ও কনেকে একসাথে বসিয়ে ধূপ জ্বেলে ধান, দূর্বা দিয়ে বাবা, মা আশীর্বাদ করে। বিয়ের মণ্ডপ থেকে বর-কনেকে ঘরে ঢোকানো হয়। তারপর বাঁদানি বসে। এরপর কনে ধান নিয়ে পেছনে দাঁড়ানো মায়ের আঁচলে দেয়। 'ঘর ভরা' করে এবং বাম হাতে একমুঠো ধান নিয়ে বিদায় নেয়।

বরের বাড়িতে বধূ ঘরে এলে মা, বোন তাদের বরণ করে দান- দক্ষিণা দিয়ে ঘরে নিয়ে আসে। বিকেলে বাঁদানি বসে। মা ছেলেকে (বর) স্নান করতে নিয়ে যায়। পুকুর ঘাটে গিয়ে ছেলে তেল-হলুদ মেখে মায়ের আঁচলে বসে স্নান করে তারপর বাড়িতে আসে। এইখানেই বিবাহের আচার অনুষ্ঠান শেষ হয়।

সামাজিক রীতিনীতি : এদের সমাজের সামজিক রীতিনীতিগুলি হল-

১. বিধবারা ইচ্ছে করলে পুনরায় বিবাহ করতে পারে। ধোবা জাতির সমাজ বিবাহ-বিচ্ছেদ সমর্থন করে না।

২. ধোবার কাছ থেকে কাপড় পাওয়ার পর ব্রাহ্মণরা পুনরায় জলে ধুয়ে কাপড়টি পরে মন্দিরে পূজায় বসে।

সমাজ অনুশাসন পদ্ধতি :আগে গ্রামে গ্রামে ধোবা সমাজে 'মাঝি' নামক সমাজপতি থাকত। দু তিনটি গ্রামের মাঝিরা মিলে বিচার করতো। তবে বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েত বা গ্রাম প্রধানের অনুশাসন মেনে চলে এই জাতির সবাই।

ট্যাবু বা নিষেধাজ্ঞা : নাগ গোত্রের লোকেরা সাপকে মারে না।

লোকউৎসব : ধোবাদের প্রধান দেব-দেবী হল মনসা, শিব, ধর্মঠাকুর, শীতলা। এরা মনসাপূজা অত্যন্ত আড়ম্বরের সাথে ও নিষ্ঠার সাথে পালন করে থাকে। এদের সমাজের যুবতীরা অনেকেই টুসু,ভাদুর পূজা করে।

ভাষা : ধোবা জাতির লোকেরা 'আড়কাষ্টি', 'মানভুঁইয়া' ভাষায় কথা বলে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারা : পুরুলিয়ার সমাজে ধোবা জাতির মানুষদের অভাব-অনটনের ছবি স্পষ্ট। এরা এখন জামাকাপড় কেচে কিংবা ইস্ত্রি করে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করেন। জীবিকার ক্ষেত্র পরিবর্তন করতে এরা বাধ্য

হয়েছেন। কেউ কেউ মুটে-মজুরের কাজ করেন। কেউ বা মুদির দোকানে, হোটেলে, রেস্তোঁরায় কাজ করে অর্থ উপার্জন করে থাকে। এই জাতির মানুষরা কাপড় কাচা ছাড়াও অন্য আয়ের পথ খুঁজে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। বর্তমানে সরকারি সাহায্য এদের জীবনকে উন্নত করার পথে সহায়ক হয়ে উঠেছে।

৮. ঘাসি

জেলার গ্রামে গ্রামে লোকসংস্কৃতি সমীক্ষার কাজ করতে গিয়ে একদল বাজনদারের দেখা পেলাম। একজনের কাছে দেখলাম লম্বা বাঁশির মতো এক অদ্ভুত বাদ্যযন্ত্র। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যন্ত্রটির নাম মদনভেরি। আমি আগে কাউকে এই যন্ত্র বাজাতে দেখি নি। তারা পরিচয় দিয়ে জানাল তারাই একমাত্র এই যন্ত্রটি বাজায়। বহুকাল ধরে তাদের এই বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তারা কোনো সম্প্রদায়ের লোক জানতে চাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে তারা বলল 'আমরা ঘাসি জাতির লোক।' আমার কৌতূহল মেটাবার জন্য তাদেরকে নিকটবর্তী চায়ের দোকানে ডেকে নিয়ে গেলাম। চা খেতে খেতে তারা আমার নানা প্রশ্নের উত্তর অকপটে সাবলীলভাবে দিল।

নৃতাত্ত্বিক পরিচয় : নৃতাত্ত্বিক দিক দিয়ে এরা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে তারা এসে পুরুলিয়ার জয়পুর থানার হাতিমুড়ি; বাঘমুণ্ডির চড়িদা, পাথরডি; বলরামপুর ব্লকের ঘাটবেড়া, রাঙাডি; ঝালদা ব্লকের ইচাগ, ব্রজপুর, আড়ষা থানা সিরকাবাদ ইত্যাদি গ্রামগুলিতে বসতি গড়ে তুলেছে। তারা প্রধানত মৎসজীবী ও কৃষিজীবী সম্প্রদায়ভুক্ত।

চেহারা বৈচিত্র্য : এদের গায়ের রঙ কালো। মাঝারি উচ্চতা। নাক ছোট। নিটোল স্বাস্থ্যের অধিকারী।

সামাজিক বিন্যাস : এদের সামাজিক বিন্যাসের মধ্যে রয়েছে উপসম্প্রদায়,গোত্র ও পদবি।

ক. উপসম্প্রদায় : ঘাসিদের মধ্যে কেউ সোনা আটি, কেউ সিমরলোকা আবার কেউ হাড়ি। এরা ঘাসিদের উপসম্প্রদায়।

খ. গোত্র : এদের গোত্রও বিভিন্ন। যেমন- নাগ, কাক, ভ্রমর, শিমুল, ভুইঞা, চামট ইত্যাদি। এদের বেশিরভাগ নাগ ও কাক গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

গ. পদবি : এদের পদবি হল ঘাসি, মাছুয়া, মাছুয়ার, নায়েব, বেহরা, মুখী, গড়াৎ, মাছোয়ার ইত্যাদি।

ঘাসিদের মধ্যে যারা মাছ ধরে জীবন ধারণ করে তাদের পদবি 'মাছুয়া'। পশুদের মৃতদেহ সরানো, পোড়ানো কাজ করার জন্য তারা গড়াৎ পদবিধারী।

বাসস্থান : ঘাসিরা মাটির ঘরে বাস করে। ঘরের দেওয়ালগুলো বেশ মোটা করে তৈরি করে। এদের ঘরের চালাগুলো ছোট ছোট আকৃতির ডাল ও কঞ্চির ওপর খড় দিয়ে ছাওয়া। কেউ কেউ খড়ের বদলে টালি, খাপরা দিয়ে চালা বানায়। মাটির ঘরগুলোতে জানালার বদলে চৌকোণো খোপ থাকে। ঘরে ঢুকবার জন্য থাকে ছোট একটি দরজা। বাড়ির সামনে থাকে উঠোন। সেখানে তুলসীমঞ্চ থাকে।

খাদ্যাভ্যাস : ঘাসিরা ভাত খায়। নুন,তেল,লঙ্কা দিয়ে খায় মুড়ি। ছাতু,গুড় ও চিঁড়া খেতেও ভালোবাসে। এরা প্রচুর মাংস খায়। ছাগল,ভেড়া , শূকর ইত্যাদি পশুর মাংস এদের প্রিয় খাদ্য। এরা দিন-রাত পরিশ্রম করে। এরা নেশাজাতীয় দ্রব্য মদ, গাঁজা, ভাঙ ইত্যাদি খায়। এরা হাইড়্যা মদ ও মহুয়া মদের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে।

ব্যবহারিক সামগ্রী : ঘাসিদের আর্থিক স্বচ্ছলতা পর্যাপ্ত নয়। তাই তৈজসপত্র তাদের বাড়িতে খুব একটা দেখা যায় না। পানীয় জল ধরে রাখার জন্য মাটির কলসি, হাঁড়ি ব্যবহার করে থাকে।রান্নার জন্য মাটির হাঁড়ি ও কড়াই ব্যবহার করে। এদের কেউ কেউ অ্যালুমিনিয়াম ও স্টিলের বাসনপত্র ব্যবহার করতে শুরু করেছে। কেউ কেউ কাঁচের গ্লাস,চীনা মাটির কাপ, প্লেট ইত্যাদি ব্যবহার করে। শাক-সব্জি রাখার জন্য তারা ব্যবহার করে বাঁশ ও বেতের ঝুড়ি, কুলা, টুপা ইত্যাদি সামগ্রী।

সাজ-পোশাক : ঘাসিদের সাদামাটা পোশাক।বিশেষ বৈচিত্র্য চোখে পড়ে না। এদের সমাজের পুরুষেরা পরে ছোটো ধুতি, গেঞ্জি। ছোট ছোট ছেলেরা প্যান্ট পরে খালি গায়ে বেশিরভাগ সময় কাটায়। বাড়ির বাইরে গেলে যুবকরা গেঞ্জি, প্যান্ট, শার্ট পরে। বয়স্ক মহিলারা সাপটা দেওয়া সাদা বা ছাপা শাড়ি পরে। বিবাহিত মেয়েরা আটপৌরে ছাপা সুতির শাড়ি একটু উঁচু করে পরে। উৎসব-অনুষ্ঠানে সিন্থেটিক,সিল্কের চকচকে শাড়ি পরতে দেখা যায়। তরুণীরা শালোয়ার, চুড়িদার পরতে ভালবাসে।

প্রসাধন সামগ্রী : ঘাসি ছেলে-মেয়েরা মাথায় মাখে তেল। মাঝে মাঝে চুলে দেয় শ্যাম্পু। গায়ে মাখে সাবান। বাইরে বেরোলে একটু সাজগোজ করে। তখন মুখে ক্রিম,একটু পাউডার লাগায়। মেয়েরা মাথায় বাঁধে রঙিন ফিতে।

অলংকার : সোনা-রূপোর দাম চড়া হলেও বিয়েতে সোনা-রূপার গয়না দিতেই হয়। বয়স্ক মহিলারা পেতলের কানের দুল,বালা,চুড়ি পরে। এরা এখন নকল সোনার গয়নার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। বউরা কেনে ইমিটিশান, পাথরের হার, চুড়ি, দুল। মেয়েরা কাঁচের চুড়ি পরতে ভালোবাসে।

জীবিকা : ঘাসিদের নিজস্ব জমি-জায়গা বলতে কিছুই নেই। তাদের ভিটেমাটিও জমিদারের আনুকূল্যে পাওয়া। তাই তারা নানা ধরনের জীবিকাকে আঁকড়ে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। নিজেদের কোনো চাষের জমি ছিল না। তাই পরের জমিতেই বেগার খাটে। এদের সমাজের নারী-পুরুষ মাটি কাটে, ক্ষেতমজুরের কাজ করে জীবন নির্বাহ করে। একসময় এরা পাল্কী বহন করতো, সহিসগিরি করতো। এখন আর এ কাজ নেই। এরা চৌকিদারগিরির কাজেও দক্ষ ছিল। খাজনা আদায়ের সময় ঢোলসহরৎ নিয়ে সারা গ্রামে ঘুরে ঘুরে গ্রামের লোকজনদের ডাকতো। গোরু-মহিষ মারা গেলে মৃতদেহ সরানোর কাজেও এদের ডাক পড়ে। গড়াইতের কাজ করতো। এরা মৃত পশুর চামড়া সংগ্রহ করে মুচিদের কাছে বিক্রি করে। মাঠে - ঘাটে পড়ে থাকা হাড়-পাঁজরা কুড়িয়ে বিক্রি করে।কেউ কেউ মড়া পোড়ানোর কাজও করে থাকে। ছাড়াও এরা মাছ ধরে নিজেদের পেটের ভাত জুটায়। বর্তমানে এরা মদনভেরি বাজিয়ে কিছু অর্থ উপার্জন করে থাকে।

ধর্ম : এরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী। হিন্দু দেব-দেবীর পূজা করে থাকে।

দেব-দেবী : ঘাসিদের প্রধান দেবী শীতলা ও মনসা। তারা শিবের আরাধনাও করে থাকে। এ ছাড়াও বারো মাস ধরে এরা গ্রামের লৌকিক দেব-দেবীদের পূজা করে।

লোকবিশ্বাস : সাধারণত নিম্ন বর্ণ হিন্দু জাতি তাই এদের মধ্যে ভূত-প্রেত, ঝাড়ফুঁক, তুক-তাক, মাদুলি, মন্ত্র-তন্ত্র প্রভৃতিতে এরা বিশ্বাসী।

লোকসংস্কার : এদের সমাজে জন্ম-বিবাহ ও মৃত্যু কেন্দ্রিক অজস্র সংস্কার রয়েছে।

ক. জন্ম-সংস্কার : শিশু সন্তান জন্মগ্রহণের পর এদের সমাজে বিবিধ সংস্কার চোখে পড়ে। সেগুলি হল-

১. জন্মের অশৌচ খুব নিষ্ঠার সঙ্গে ঘাসিরা পালন করে।

২. সাত থেকে নয়দিন তাদের জন্ম অশৌচ চলে। জন্ম অশৌচ শেষ হয় 'লারাত' অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। রান্নায় ব্যবহৃত মাটির জিনিসপত্র তারা ফেলে দেয়। শিশুর গায়ে তেল-হলুদ মাখায়। প্রসূতি নখ কেটে স্নান সেরে অশৌচ দূর করে।

৩. একুশ দিনে 'একুশা' পালন করে। এক মাস প্রসূতি রান্না ঘরে ঢুকতে পারে না।

৪. শিশুর মুখেভাত অনুষ্ঠানে তাকে মামাবাড়ির ভাত খাওয়ানো হয়।

খ. বিবাহ-সংস্কার : এদের বিবাহ-সংস্কারগুলি হল। যথা-

১. স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই সাঙ্গা করতে পারে। এখনও এদের সমাজে 'সাঙ্গা'প্রথা আছে।

২. পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকতে পারে। স্বগোত্রে এদের বিবাহ হয় না।

৩. বিবাহের ক্ষেত্রে কন্যার গুরুত্ব বেশি। সম্বন্ধ স্থাপনের প্রস্তাব নিয়ে পাত্র পক্ষকেই এগিয়ে আসতে হয়। আগে বিয়ের কথাবার্তা চলত হেঁয়ালির মাধ্যমে। যেমন- 'আপনার চালায় একটি লাউ ধরেছে, ওটি আমরা পেতে চাই'। তখন কন্যাকর্তা ভাব বুঝে ব্যক্ত করবেন- দিতে পারি, তবে এখন লাউয়ের বড় দর। কন্যাপক্ষের সম্মতির পর পণের প্রসঙ্গ ওঠে। কন্যাপক্ষ পণ নিত। দর কষাকষি চলত। তিন বারের পর তাদের বিষয়টির মীমাংসা হত। সাধারণতঃ তিন-পাঁচ খানা শাড়ি, ১০১ টাকা দিতেই হোত। পাত্রীপক্ষকে সোনা-রূপার গয়না ,থালা দিতে হয়। কন্যাপক্ষ গলবস্ত্র হয়ে শালপাতার উপর জলের ঘটি ধরে জোড় হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। গাঁভায়া ঘটিটি হাতে ধরে সম্মতি দিলে বিয়ে পাকা হয়। গাঁভায়া বিবাহে পৌরোহিত্য করেন। এই চিত্র এখন অনেকটাই বদলে গেছে। কন্যাপণের জায়গায় বরপণ জায়গা করে নিয়েছে। এখন কন্যাপক্ষকে বরপণ দিতে হয়। মেয়ে পছন্দ হওয়ার পর পাত্রপক্ষ পণ দাবী করে ।পাকা কথার পরে বিয়ের কথাবার্তা চলে।

৪. শুভ দিন দেখে আশীর্বাদি অনুষ্ঠান সেরে ফেলে। সোনা বা রূপোর গয়না দিয়ে কনেকে আশীর্বাদ করে। আবার সোনা-রূপোর আংটি,গলার চেন দিয়ে বরকে আশীর্বাদ করে।

৫. ছাদনাতলা তৈরি করে। বাঁশের খুঁটি গাঁড়ে। আম ডাল দিয়ে সাজায়। গোবর ও ছুঁচ মাটি দিয়ে নিকানো উঠোনে চালগুঁড়ির আলপনা দেয়।

৬. বরের বাড়ি থেকে কনেবাড়িতে বরের মামাবাড়ির লোক লগ্ন নিয়ে আসে। একটি নতুন গামছায় বা মাটির ভাঁড়ে শন দিয়ে বাঁধা পাঁচটি গোটা হলুদ, একটি রূপোর টাকা, আতপ চাল রেখে বেঁধে নিয়ে আসে। ছাদ্নাতলায় লগ্ন এনে রাখে। সেখানে একটি প্রদীপ, আলপনা দেওয়া পিঁড়ে ও তেল-হলুদ রাখা একটি বাটি থাকে। লগ্নটিকে কনের মা ধান ও দূর্বা দিয়ে ও প্রদীপ জ্বেলে পূজা করে। রাতের দিকে কনেকে তেল-হলুদ মাখায়। কেউ কেউ গান করে থাকে।

গ. মৃত্যু-সংস্কার : এদের মৃত্যু-সংস্কারগুলি হল-

১. মৃতদেহ দাহ করা হয়।

২. কেউ মারা গেলে দশ দিন মৃত অশৌচ পালন করে।

৩. আগে পনেরো দিনে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পালিত হোত। এখন এগারো দিনের দিন শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পালন করে। এটাই এদের সংস্কার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিবাহরীতি : বর ও কনের তেল-হলুদ হবার পাঁচ থেকে আট দিনের ব্যবধানে বিয়ে হয়। তেল-হলুদ অনুষ্ঠানটি বর ও কনের নিজের নিজের বাড়িতে পৃথক পৃথক ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। আইবুড়ো ভাত খায়।

বিয়ের দিন বাড়ির মেয়েরা বিয়ের জল সাইতে মাটির হাঁড়ি নিয়ে পুকুর ঘাটে যায়। অনেকে গান করে। পাড়ার মেয়েরা 'জলসাহা' অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণ করে থাকে। এরপর 'মাটি সাহা' বা 'মাঠকাড়ান' অনুষ্ঠান হয়। বাড়ির মেয়েরা ডালা, টুপা, সিধা ডাল ও লাটাই নিয়ে মাটি কেটে মাটি ভরে আনে।

বিয়ের লগ্ন শুরু হওয়ার আগেই বর ধুতি, পাঞ্জাবি ও টোপর পরে বিয়ে করতে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়। রওনা দেয় কনে বাড়ির উদ্যেশ্যে। এদিকে কনে বাড়ির আত্মীয়স্বজনেরা কনেকেও শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ, শাঁখা, নোয়া পরায়। মুখে স্নো, পাউডার, চোখে কাজল পরায়। চুলের খোঁপায় ওড়না আটকে দেয়। কপালে চন্দনের ফোঁটা, পায়ে আলতা পরিয়ে কনের সাজে তাকে সাজিয়ে তোলে। রঙ্গ-রসিকতা ,আনন্দ স্ফূর্তিতে মজে থাকে। বরপক্ষ গ্রামের মাথায় পৌঁছলেই কনেবাড়িতে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। গাঁভায়া, কন্যাকর্তা এবং অন্যান্য লোকেরা তাদের অভ্যর্থনা জানাতে হাজির হয়। আগে সেখানেই হাঁড়িয়া পান ও আতিথি আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হোত। এখন নিয়ম নীতি বদলে গেছে। কনে বাড়ির দুয়ারে বর এলে কনে পক্ষের গাল মন্দের যুদ্ধ লেগে যায়। এরপর চলে 'বর-পরছা'অর্থাৎ বরের পরীক্ষা। কনের মা তাকে গুড়-জল খাওয়ায়। সে মাথা নুইয়ে প্রণাম করে। অধিবাসের তত্ত্ব এলে আরো একবার তেল-হলুদ মাখানো হয়।

বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হয়। বরকে ছাদ্না তলায় আনে। কনেকে বাচা ডালিতে করে নিয়ে আসে। আকন্দ ফুল ও গুয়া-পৈতার মালা বদল করে। বর কনের সিঁথিতে সিঁদুর দান করে। দুজনের বিয়ে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ছাদ্না তলায় বর ও কনে দুজনকেই কোলে করে তিনবার ঘোরায়। অনেকে গান জুড়ে দেয়-

" পস্তু গাছে চটি বসেছ্যে গো পস্তু গাছে চটি বসেছ্যে।
ও চটি খেদো না গো মধু খাতে বসেছে।।"

বর ও কনেকে বাসর ঘরে নিয়ে যায়। সেখানে বরের শ্যালিকারা পথ আটকে দাঁড়ায়। তাদের পাওনা দাবী করে। পাওনা দিলেই বর-কনে ঘরে ঢুকতে পায়। শ্যালিকারা বর ও কনের পা ধুইয়ে দেয়। বর-কনেকে গুড়ভাত খাওয়ায়।

বিদায় লগ্ন এসে যায়। করুণ সুরের গান গেয়ে ওঠে মেয়েরা। কনে মায়ের আঁচলে চাল ফেলে 'ঘর ভরা ' করে। বরের সাথে চলে শ্বশুর বাড়ি। শ্বশুরবাড়িতে বর-বধূকে বরণ করে ঘরে ঢোকানো হয়। কিছু লোকাচার পালন করতে দেখা যায়। বিয়েতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের ছাগল, ভেড়া, শূকরের মাংস ও হাইড়্যা মদ খেতে দিতে হয়।

সামাজিক রীতিনীতি : ঘাসিদের সামাজিক রীতিনীতি হল-

১. ঘাসিদের কোনো অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ পুরোহিত অংশগ্রহণ করে না।

২. বিবাহ, জন্ম, মৃত্যুর অশৌচ পালন করার পর সমস্ত সম্প্রদায়কে নিমন্ত্রণ করে ভোজ খাওয়াতে হয়। কম করেও তিন মণ চালের হাইড়্যা মদ বড় বড় হাঁড়ায় রাখা হয়। থালা -বাসন সর্বস্ব বাঁধা দিয়ে বা বিক্রি করে মদের ব্যবস্থা করে। পূর্ব পুরুষদের এই রীতি আজও এরা ধরে রেখেছে।

৩. বিয়েতে সোনা-রুপোর গয়না চাই।

৪. এরা জলচল নয়। এদের হাতের ছোঁওয়া জল কেউ খায় না। এদের ভদ্র বাড়ির দাওয়ায় ওঠা নিষেধ।

সমাজ অনুশাসন পদ্ধতি : গ্রামের সমাজপতি 'গাঁভায়া' হিসেবে পরিচিত। তিনিই সমস্ত অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন। বিচার-ব্যবস্থার ভারও তার ওপর রয়েছে। তবে এরা বর্তমানে পঞ্চায়েতের বিচার ব্যবস্থার ওপর আস্থাশীল।

টোটেম বা কুলচিহ্ন : ঘাসিদের মধ্যে টোটেম আছে। সেগুলি হল- কচ্ছপ, কাওয়া নাগ, তুইফোঁড় ইত্যাদি।

ট্যাবু বা নিষিদ্ধ : টোটেম বাচক জীব, পাখি, সরীসৃপ, বৃক্ষলতা এদের কাছে পবিত্র। তাই এগুলির ক্ষতিসাধন করে না।

লোকউৎসব : সমগ্র ঘাসি সম্প্রদায় শ্রাবণ সংক্রান্তি থেকে শুরু করে সারা ভাদ্র মাস ধরে মনসা দেবীর আরাধনা করে। মনসার প্রতিমা নয় এরা সিধা ডাল পূজা করে মনসা দেবীর প্রতীক রূপে। তুলসীমঞ্চের পাশে সিধা ডাল পুঁতে মনসা পূজার সময় হাঁস বলি দেয়। চৈত্র মাসে এরা মা শীতলার পূজা করে। গাঁয়ের পরবেও আনন্দে মেতে ওঠে।

ভাষা : কুর্মী সম্প্রদায়ের পাশাপাশি বাস করার দরুণ একসময় এরা কুড়মালি ভাষায় কথা বলত। তবে এখন এরা স্থানীয় 'মানভুঁইয়া' ভাষায় কথা বলে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারা : সমাজের সবচেয়ে নিচের তলায় থেকে আজও ঘাসি সম্প্রদায়ের লোকদের জীবন ভবঘুরে, ছন্নছাড়া। অবহেলা আর অনাদরের মধ্য দিয়ে চলে তাদের জীবন সংগ্রাম। প্রচণ্ড সংগ্রাম করেও বাঁচার জন্য যে রসদ জোগাড় করে তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। বাঁচার তাগিদে তাই এরা পরের ঘরে মুনিষ-কামিনের কাজ করে থাকে। এদের দৈন্য দুর্দশা দূর করার জন্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এসেছে। এদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে।

৯. হাড়ি

পুরুলিয়া জেলার বিখ্যাত নাটুয়া নাচ। এই নাটুয়া নাচের প্রবাদপ্রতিম শিল্পী হলেন গুণধর সহিস। ইনি হাড়ি সম্প্রদায়ের লোক। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের মধ্য থেকে গুণধর সহিসের মতো প্রতিভাধরের আবির্ভাব এক বিস্ময়কর ঘটনা। তাঁর নৃত্যশৈলীর আলোয় হাড়ি সম্প্রদায়ের মানুষের মুখ উজ্জ্বল হয়েছে।

নৃতাত্ত্বিক পরিচয় : হাড়ি জাতি হিন্দু সমাজের আদিম মানব গোষ্ঠীর অন্তর্গত। আর্য বা মুসলমানদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে বাংলায় এদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ভুঁইমালি থেকে এদের উৎপত্তি। এরা মেথর , মেথোর, ভাঙ্গি, বাল্মীকি নামেও পরিচিত। এরা প্রচণ্ড পরিশ্রমী। গ্রাম বা শহর যে কোনো স্থানেই বসবাসে সক্ষম। এরা দ্বিজ-বর্ণ, সৎ-শূদ্র এবং নবশাখ গোষ্ঠীর অন্তর্গত।

চেহারার বৈচিত্র্য : হাড়ি সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষ উচ্চতা মাঝারি। গায়ের রং বিশেষত কালো। শারীরিক সক্ষমতার জন্য দেহের গঠন সুঠাম এবং নিটোল।

সামাজিক বিন্যাস : এদের সামাজিক বিন্যাসে উপসম্প্রদায়, গোত্র ও পদবি চোখে পড়ে। যেমন-

ক.উপসম্প্রদায় : হাড়িদের মধ্যে বিভিন্ন ভাগ রয়েছে। হাড়িদের নানা শ্রেণিগুলির নানা নাম রয়েছে। যেমন- বড়ভাগিয়া বা কাওরা পাইক, মধ্যভাগিয়া বা মধউকুল, খোরে অথবা খোরিয়া, শিউলি, মেথর, বাঙালি মঘইয়া, করইয়া, পুরন্দর।বড়ভাগিয়া সম্প্রদায় চৌকিদারি, বাজনদার এবং পাল্কি বাহকের কাজ করে। এদের পদবি সাধারণত 'সহিস'।

খ. গোত্র : এরা শাল গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

গ. পদবি : হাড়ি সম্প্রদায়ের লোকেরা হাড়ি,সহিস,রাম পদবি ব্যবহার করে।

বাসস্থান : অস্পৃশ্য জাতি বলে এরা গ্রামের প্রান্তে বসতি গড়ে তুলেছে। ঝুপড়ির মধ্যে একান্তে এরা বাস করে। বাউরি,ডোম,চামার ইত্যাদি জাতিদের থেকে এরা আলাদা। এদের বেশিরভাগ লোক মাটির ঘরে বাস করে। এদের ঘরগুলো সাধারণত খড় দিয়ে ছাওয়া। বর্ষায় খড়গুলো জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে। তাই টালি বা খাপরা দিয়ে ঘরের চালা তৈরি করে। কেউ কেউ ভালো রোজগার করে বলে পাকাবাড়ি তৈরি করে বাস করে। এরা হাঁস, মুরগি, শূকর পালন করে বলে ঘরের লাগোয়া মাটির খোঁয়াড় তৈরি করে। এই খোঁয়াড়ের উচ্চতা দু-হাতের মতো। ঘরের সামনে থাকে উঠোন। এখানেই থাকে তুলসী মঞ্চ। পাশে মনসা গাছের ডাল পোঁতা থাকে।

খাদ্যাভ্যাস : হাড়িরা ভাত খেতে খুব ভালোবাসে। দিনে এরা তিনবার ভাত খায়। ভাতের সাথে শাক-সব্জির তরকারি খায়। অল্প একটু তরকারি দিয়েই তারা থালাভর্তি ভাত অনায়াসে খেয়ে ফেলতে পারে। পান্তা ভাত, মাড় ভাতও এরা খায়। এরা মাংস খেতে খুব ভালোবাসে। পাখির মাংস, শূকরের মাংস, মেঠো ইঁদুরের মাংস খায়। এরা হাইড়্যার নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে।

ব্যবহারিক সামগ্রী : অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া জাতি বলে এদের বেশিরভাগ লোক মাটির জিনিসপত্র ব্যবহার করে। মাটির হাঁড়িতে ভাত রান্না করে। রান্নার জন্য তারা লোহার কড়াই, খুন্তি ব্যবহার করে। তাদের ঘরে অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি,কলসি,গামলার এবং স্টিলের থালা,বাটি ইত্যাদি বাসনপত্র সাজানো থাকে। মাটির হাঁড়ি, কলসি আর কুঁজোর ঠাণ্ডা পানীয় জল তাদের তৃষ্ণা মেটায়। পিঠে পুলি বানাতে মাটির মালসা ব্যবহার করে।

ময়লা, আবর্জনা ফেলবার জন্য তাদের ঘরে কোদাল, বেলচা, গাঁইতি ইত্যাদি লোহার যন্ত্রপাতি দেখা যায়।

সাজ-পোশাক : হাড়ি জাতির পুরুষেরা ধুতি, ফতুয়া, জামা পরে। আর মেয়েরা পরে শাড়ি,সায়া,ব্লাউজ। তবে উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মেয়েদের পোশাক হয় রঙিন ও ঝলমলে। আধুনিক হাল ফ্যাশনের জামা-প্যান্ট ছেলেরা পরে। মেয়েরা শালোয়ার কামিজ,চুড়িদার,ওড়না ইত্যাদি পোশাক পরতে ভালোবাসে।

প্রসাধন সামগ্রী : এদের রূপচর্চার প্রধান সহায়ক বাজারের চলতি সস্তা দামের স্নো-পাউডার। ক্লীপ ,ফিতে, টিপ,লিপস্টিক, নেলপালিশ, কাজল আরও কত প্রসাধনী দ্রব্য এদের জীবনধারায় ব্যবহৃত হয়।

অলংকার : দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিন কাটালেও মনকে খুশিতে ভরে তোলার জন্য এই জাতির মেয়েরা গয়না পরতে ভালোবাসে। সোনা কেনার সামর্থ্য বেশিরভাগ মেয়েদের থাকে না বলে তারা রূপোর গয়না কিনে মনের সাধ মেটায়। কেউ কেউ সামর্থ্য থাকলে হাল্কা সোনার গয়না পরে। হাতে চুড়ি, পাথর বসানো বড় বড় কানের দুল, গলায় হারের সেট মেয়েদের খুব পছন্দের।

জীবিকা : কায়িক পরিশ্রমের জন্য হাড়ি জাতির লোকেদের কদর বেশি। হাড়ি জাতির বিভিন্ন উপসম্প্রদায় জীবিকার জন্য নানা ধরনের কাজ করে। যেমন -

১.বড়ভাগিয়া- চৌকিদারির কাজ করে ।

২.মধ্যভাগিয়া- এরা বিবাহ অথবা কোনো শুভ কাজে বাদকের কাজ করেন এবং পাল্কি বাহকের কাজ করে থাকে।

৩. খোরে- এরা শূকর প্রতিপালন করে।

৪. শিউলি- তালকাটা হাড়ি, খেজুর গাছের রস সংগ্রহ করে এবং তাড়ি প্রস্তুত করে।

৫. মেথর- মল, মূত্র ও আবর্জনা পরিষ্কার করে।

৬. নাড়িকাটা হাড়ি- এরা নবজাতক শিশুদের নাড়ি কাটে। এরা ' ধাইমা' নামে পরিচিত। এদের সমাজের বয়স্ক মহিলারা ধাইমার কাজ করে থাকেন।

এদের অনেকেই চাষবাসের ক্ষেত্রে দিনমজুরের কাজ করে। অনেকে মজুরের কাজ , মালবাহকের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। বর্তমানে এদের কেউ রিক্সা কেউ টোটো গাড়ি চালাচ্ছে। এদের মধ্যে যারা ছৌ নাচ, নাটুয়া নাচে পারদর্শী তারা বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠানে শিল্প প্রদর্শন করছেন। নাচ-গানের মধ্য দিয়ে এরা অর্থ উপার্জন করে থাকে। বর্তমানে লেখাপড়া শিখে তারা জীবিকার পরিবর্তন করেছে।

ধর্ম : এরা হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত। হাড়িরা নিজেদের হিন্দু বলে মনে করে। এদের মধ্যে শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ই আছে। এই জাতির লোকেরা প্রকৃতির পূজার পাশাপাশি নানা হিন্দু দেব-দেবীর পূজার্চনা করে থাকে।

দেব-দেবী : মনসা, শীতলা, ধর্মরাজ ইত্যাদি দেব-দেবীর পূজা করে। এদের দেবী হলেন মনসা। সহিস জনগোষ্ঠীর নিজস্ব লৌকিক দেবতা হল 'বিরহি ঝাঁপড়ি'। এই দেবতা কূল দেবতা হিসাবে পূজিত হন। মানবাজার ২ নং ব্লকের নলকুড়ি গ্রামের পুকুর পাড়ে বট গাছের তলায় সিঁদুর মাখা ছোট কালো পাথরের মূর্তি। এই দেবতাকে ১লা মাঘ পূজা করা হয়। পূজার পুরোহিত সহিস সম্প্রদায়ের লায়া। ঘি, গুড়,আতপ চাল, সিঁদুর প্রভৃতি এই পূজার উপকরণ। শূকর বলি দেওয়া হয়। বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির হাত থেকে রক্ষার্থে এই পূজা করা হয়। কেবলমাত্র পুরুষরাই এই প্রসাদ গ্রহণ করতে পারে। পূজা প্রাঙ্গণে প্রসাদ রান্না করতে হয়।

লোকবিশ্বাস : একসময় এই জাতির লোকেরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ছিল। তাই নানা ধরনের অন্ধবিশ্বাস ও সংস্কার ছিল এদের নিত্যসঙ্গী। । এর ফলে ডাইনি, ভূতপ্রেত,ওঝা,ঝাড়ফুঁক,তুকতাক,সখ্যান ইত্যাদি লোকবিশ্বাস তাদের সমাজের অনেক গভীরে প্রসারিত হয়েছে।

লোকসংস্কার : এদের সমাজের নর-নারীদের আচার-আচরণে লোকসংস্কারের বৃহৎ জগৎ পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। যেমন-

ক. জন্ম-সংস্কার : শিশু সন্তান জন্ম গ্রহণ করার পর এরা অজস্র সংস্কার মেনে চলে। যথা-

১. সাত মাসে কাপড়,ফল দিয়ে প্রসূতিকে সাধ খাওয়ানোর রীতি আছে।।

২.শিশু সন্তান বাড়িতে জন্মালে থালা এবং কাঁসা,পিতলের ঘন্টা বাজানো হয়।

৩. হাড়ি সম্প্রদায়ের বাড়িতে শিশু সন্তান জন্মালে সন্তানের নাড়ি কাটার জন্য এদের সমাজের ধাইমাকে ডেকে আনতে হয়।

৪. শিশু ও প্রসূতিকে সেঁক দেওয়ার কাজটি করে ধাইমা।

৫. হাসপাতাল থেকে বাড়ি এলে প্রসূতি ও শিশু সন্তানের যাতে কোনো অসুবিধে না হয় সেই দিকে ধাইমা লক্ষ্য রাখেন। প্রসূতি ও বাচ্চাকে ন' দিন ধরে আগুনের সেঁক দেয়। এদের সমাজে ন' দিন ধরে অশৌচ পালন করে।

৬. চার দিনের দিন প্রসূতিকে 'ঝালভাত' খাওয়ানোর জন্য মুরগির মাংস ও ভাত রান্না করে খাওয়ায়। 'ঝাল ভাত' ঘিয়ের সাথে ফুটিয়ে খাওয়ানো হয়।

৭. ন' দিনে 'লরাত' অনুষ্ঠানটি পালন করে। এইদিন তারা ঘর দোর, উঠোন গোবর জল দিয়ে নিকিয়ে তোলে। প্রসূতির কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করে। পাড়ায় প্রতিবেশীকে তেল-হলুদ দেয়। । প্রসূতি পুকুর ঘাটে স্নান করে নতুন জামা-কাপড় পরে। একটি ডিম, আমলা-বাসলা, সিঁদুর, কাজল, গোবর, খোলায় চিঁড়া, গুড়, প্রদীপ, ধূপ, একুশটি পিঠে দিয়ে মা গঙ্গাকে পূজা করে।

৮. পুকুর ঘাটের একপাশে কড়াইতে চাল নাড়ে। এরপর পরিবারের মেয়েরা ধাইমা ও প্রসূতির সাথে গ্রামের ষষ্ঠী বটতলায় যায়। ধাইমা পূজা দেয়। নবজাতকের মা ষষ্ঠী বটতলায় বুকের দুধ দান করে।

৯. একুশার দিন একুশটি পিঠা মা ষষ্ঠীকে দান করতে হয়। লোকজনদের খাওয়ানো হয়।

১০. বর্তমানে ধাইমা টাকা এবং নতুন একটি শাড়ি দাবি করেন। মেয়ে জন্মালে ১০ সের এবং পুত্র সন্তান হলে ২০ সের ধান দিতে হয়।

১১. সাত মাসে মেয়েদের এবং ছয় মাসে ছেলেদের নিজের বাড়িতেই 'মুখেভাত' অনুষ্ঠান হয়। তারপর মামা বাড়ি গিয়ে মামা ভাত খেতে পারে।

১২. 'আলহই' খাওয়ানো হয় শিশুদের।

বিবাহ-সংস্কার :

১. স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই দ্বিতীয়বার বিবাহ বা ' সাঙ্গা' করতে পারে। বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। তবে তিনটির বেশি বউ রাখা যাবে না। এমন সংস্কার এদের সমাজে এখনও রয়েছে।

২. হাড়ি জাতির স্বগোত্রে বিবাহ চলে না।।

৩. পাত্রীপক্ষের লোক প্রথম পাত্রপক্ষের বাড়িতে যায় বিয়ের কথাবার্তা বলার জন্য।আগে পাত্রীকে তিনটাকা পণ দিতে হোত। কিন্তু এখন পাত্রপক্ষকে পণ দিতে হয়। মোটর সাইকেল, ঘড়ি,নগদ টাকা প্রভৃতি তারা বরপণ হিসাবে দাবী করে। বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে গেলে শুভদিন দেখে আশীর্বাদির দিন ঠিক হয়।

৪. আশীর্বাদের দিন কনে পক্ষ পাত্রের জন্য নতুন ধুতি, জামা, গেঞ্জি, সোনার আংটি নিয়ে উপস্থিত হয়। সেই সব জিনিস পরে আশীর্বাদ অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। একইভাবে পাত্রপক্ষ পাত্রীকে আশীর্বাদ করতে আসে।

৫. পাত্রপক্ষ আশীর্বাদির তত্ত্ব,মিষ্টি নিয়ে হাজির হয়। তুলসী তলায় একটি থালায় আতপ চাল, ধান, প্রদীপ, বাঁশের কুলা, দূর্বা ঘাস,ঘটিতে জল রাখা থাকে। সেখানেই কনেকে আশীর্বাদ করে। পাত্রপক্ষ মেয়ের গাল নোড়া দিয়ে সেঁকে। জলঘটি ঘুরিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

৬. নিমন্ত্রণ করার নিয়ম হল ভাঁড় হাতে নিয়ে সেই বাড়িতে উপস্থিত হলে তাঁকে পা ধোওয়ার জল দেয়। সেই ঘটিতে হলুদ, সুপারি ফেলে দিয়ে বলতে হয় ' অমুক লোকের বেটা বা বিটির বিহা'। পাঁচ পোয়া/ সাত পোয়া

হলুদ মাখানো আতপ চাল, তিনটি হলুদ, একটি টাকা, হলুদ দিয়ে শন পাকানো, দূর্বা ঘাস, শন দিয়ে পরিবেষ্টিত বাটি বসানোর বিড়ি- ব্রাহ্মণ এই দ্রব্যগুলি মন্ত্রঃপুত করে গামছায় বেঁধে দেয় এটিই হল লগন চাল। দুই বেহাইয়ের মধ্যে তিনবার লগন চাল বদল করে এবং শেষে পাত্রীপক্ষ গামছায় বেঁধে নিয়ে যায়। বিয়ের দিন পর্যন্ত পাত্রীকে তেল-হলুদ মাখানো হয়। কাজ শেষে প্রত্যেককে এক বাটি মুড়ি দেওয়া হতো। একে ' সারুয়া মুড়ি' বলে।

৭. গায়ে হলুদের দিন কনের হাতে থালার চাল দেবে মেয়েটি থালায় রেখে দেবে তিনবার । একটি পাত্রে তেল, হলুদ, চাল একসাথে রেখে দেয়। কাজল লতা হলুদ শাড়িটিতে বাঁধা থাকে। বাড়ির মেয়েরা গায়ে হলুদ দেয়। ধান,দূর্বা ,চাল দিয়ে আশীর্বাদ করে । বাড়ির মেয়েরা পুকুর ঘাটে গিয়ে সিঁদুরের দাগ দিয়ে তার ওপর পান পাতা বসায়। পানের ওপর একটি ডিম, আতপ চাল, লাড্ডু, সুপারি রাখে । প্রদীপ,ধূপ জ্বেলে ঘাটপূজা করে। কুলায় বিরি কলাই জলে ধুয়ে কুলার ওপর সিঁদুরের দাগ দেয়। মার্কিন ঢেকে মন্দিরে যায় । পূজা দেয়।

৮.এরপর ছাদ্‌নাতলা তৈরি করার তোড়জোড় শুরু হয়। মাটি খুঁড়ে সিধা ডাল পোঁতে ।বেনা গাছ, আম পাতা দিয়ে সুতো দিয়ে বাঁধে। মাটির প্রলেপ দিয়ে ছাদ্‌না তলা তৈরি করে।

৯. বসুধারা পূজা শুরু হয়। গোবরের প্রলেপ দিয়ে গোল করে তার ওপর সিঁদুরের দাগ দেওয়া বঁটি শুইয়ে রাখে। অল্প চাল, একটি লাড্ডু, একটি গ্লাসে দুধ থাকে । মুরগিকে সিঁদুরের টিপ পরিয়ে চাল খাওয়ায় তারপর বলি দেয় । মুণ্ডুতে জল দেয়। দা তে সিঁদুরের দাগ দেয় এবং লাড্ডুটা দায়ের মাথায় গাঁথে।

মৃত্যু-সংস্কার : এদের সমাজের মৃত্যু-সংস্কারগুলি হল-

১. হাড়ি জাতির কেউ মারা গেলে তার মৃতদেহে ঘি ও চন্দন মাখানো হয় আর চোখে রাখা হয় তুলসীপাতা।

২. শ্মশানে মৃতদেহ দাহ করে।

৩. বাড়ির বড় ছেলে মুখাগ্নি করে। দাহ করার পর অস্থি গোয়াল ঘরে রাখে। আর চিতাভস্ম কাছাকাছি কোনো পুকুর বা নদীতে ভাসিয়ে দেয়।

৪. তিন দিনে আড়াইটা নিম পাতা দিয়ে 'তিতা ভাত' খায় । পাঁচ,সাত,ন'দিনে হবিষ্যি করে।

৫.মৃত্যুর পর দশম দিনে শূকর উৎসর্গ করা হয় মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি কামনায়। এই উপলক্ষে মৃত ব্যক্তির ভগিনীর পুত্র বা বোনপো পুরোহিতের কাজ করে । দশ দিনে শ্রাদ্ধের কাজ হয় ।

৬. এগার দিনে 'দধিগাদা' হয়।

বিবাহরীতি : পাত্র-পাত্রীপক্ষের গায়েহলুদ অনুষ্ঠানের পর সন্ধ্যায় বাড়ির মেয়েরা জল সাইতে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়। । ঘাটে গিয়ে আবার ঘাট পূজা করে। পাঁচটি পানে সিঁদুরের দাগ দেয়। একটি ডিম, একটি লাড্ডু,ধূপ,প্রদীপ জ্বেলে পূজা করে। তারপর দা দিয়ে জল কাটে। জল ভাঁড়ে ভরে এনে ছাদ্‌নাতলায় রাখে ছাদ্‌নাতলায় সিধা ডালটিকে কনের বাবা মা পানপাতায় ঘি দিয়ে পূজা করে । কুলায় সিঁদুর, পানপাতা, বিরি কলাই দেওয়া প্রদীপ জ্বলে। সুতো দিয়ে জলসাওয়া হাঁড়িটা বাঁধা হয়। কনেকে মিষ্টি মুখ করায় ।

ছাদ্‌নাতলায় প্রথমে কনের বাবা-মার বিয়ে হয়। গাঁট বন্ধন করে সিধা গাছটি ঘোরে । গাছটিকে পূজা করে। এরপর ছাগ বলি, মুরগি বলি দেওয়া হয়। পুরোহিত একটি থালায় ধান,দূর্বা দেয়। বাড়ির বড় মেয়েরা তাদের ধান,দূর্বাঘাস দিয়ে আশীর্বাদ করে ।

আকন্দ ফুলের মালা থাকে পাত্রের গলায়। বরের মা, পিসি প্রভৃতি রমণীরা উপবাস করে পাত্রকে আশীর্বাদ করে এবং বরের মুখের উচ্ছিষ্ট খাবার খায়। এটিই 'আম্ল খাওয়া'।

এরপর 'কাঁকন বাঁধা' অনুষ্ঠানটি হয়। এখানে সাতটি সাতাশী খাড়ি অর্থাৎ আমের ডাঁটা আম পাতার ভিতর সরিষা সুতায় বেঁধে বরের ডান হাতে পরিয়ে দেয়। তেমনি কনের ডান হাতে মহুল পাতা ও সরিষা বেঁধে দেওয়া হয়। কনের বাড়িতে 'জলসাহা' অনুষ্ঠানটি পালনের পূর্বে 'কাঁকন বাঁধা' অনুষ্ঠান করতে হয়।

বর-কনে পরস্পর বিপরীত দিকে বসে। বর ও কনেকে পিতা বা বয়োজ্যেষ্ঠ কোলে বসায়। এরপর পাঁচবার স্থান বদল করে। বর এবং কনের মধ্যে আকন্দ ফুলের মালা বদল, পান খিলি বদল, আমপাতা বদল, শিনৈ বদল হয়। শেষে হয় সিঁদুর দান। সিঁদুর দানে বর লোহার জাঁতিতে করে কনের কপালে তিনবার সিঁদুর ছোঁওয়ায়। তারপর সিঁথিতে সিঁদুর পরায়।

বর্তমানে বিবাহরীতিতে কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। বরের গায়ে হলুদ হওয়ার পর বর, কনে ছাদ্না তলায় এসে উপস্থিত হয়। দুজনে পিঁড়িতে বসে।একটি থালায় চাল, দূর্বা দিয়ে ছাদ্নাতলায় পূজা হয়। এরপর বর -কনেকে চাল, দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করে ব্রাহ্মণ পুরোহিত। আগ্নি জ্বেলে তাতে ঘি দিয়ে পূজা করে। পান আহুতি দেওয়া হয়। এরপর 'ব্রাহ্মণ সাক্ষী, অগ্নি সাক্ষী, কুটুম্ব সাক্ষী' উচ্চারণ করে কনের হাতে ফুল দেয় আর কনের হাতের ফুল ও চাল নিয়ে ছাদ্না তলায় চাল তিনবার দান করে।

সিঁদুর দানের সময় কনের চোখ ঢেকে দিতে হয়। মন্ত্র উচ্চারণ করে বর টাকায় সিঁদুর লাগিয়ে কনের সিঁথিতে সাতবার সিঁদুর দেয়। তারপর বর-কনের গাঁটবন্ধন হয়। বর কনেকে ধরে থাকে। কনে ছোট কুলায় খই ছড়াতে ছড়াতে তিনবার ঘোরে। বরের গলার আকন্দ ও সুপারির মালা কনের গলায় দেবে কনে সেই মালা বরের গলায় দেবে তিনবার হবে মালাবদল। বর-কনেকে পশ্চিম দিকে মুখ করে বসতে হয়।' বিটি জামাই পালি' তিনবার বলতে হয়।

এরপর বাঁদানি বসে কাঁসার থালায় জল দিয়ে বরের পায়ের বুড়ো আঙুল ধরে থাকে শ্যালিকারা। টাকা দিলে পা ছাড়ে জল দিয়ে পা ধোয়ানো হয়। বিদায় লগ্ন এসে উপস্থিত হয়। কনে মায়ের বুকের দুধ খায়। কনে 'ঘর ভরা' অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিদায় নেয়।

বিয়ের পর বর ও বধূ ঘরের দুয়ারে উপস্থিত হলে বরের মা জল ঘটি নিয়ে হাজির হয়। ঘটিতে কাঁটা,বালা লুকানো থাকে। বধূকে কাঁটার মধ্যে থেকে নোয়া বের করে বরের হাতে দেয়। বর সেটি হাতে নিয়ে বধূর কপালে,পায়ে ছুঁইয়ে ঘটির মধ্যে ফেলে দেয়। বধূটি আবার তুলে বরের হাতে দেয়। তিনবারের বেলা বর নোয়াটি বধূর বাম হাতে পরিয়ে দেয়। বৌদি নোড়া কাপড়ে নিয়ে বউয়ের আঁচলে দিয়ে তিনবার বলে-' ছেল্যা পালি?ছেল্যা পালি ? ছেল্যা পালি?' বউ উত্তরে বলে 'ছেল্যা পালি।' নোড়াটা নিয়ে বউ বরের হাতে দেয়। বর বউকে তা ফিরিয়ে দেয়। বধূ নোড়াটি নিয়ে গৃহে প্রবেশ করে। এরপর হয় 'বউ ভাত' অনুষ্ঠান। সারাদিন ভুরি ভোজনের আয়োজন চলে।

সামাজিক রীতিনীতি : এদের সমাজের সামাজিক রীতিনীতিগুলি হল-

১. হাড়িদের সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ ও বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। এদের সমাজে নিয়মের কিছুটা শিথিলতা লক্ষ্য করা যায়। তবে বড়ভাই মারা গেলে বৌদিকে ছোট ভাই বিয়ে করতে পারে না।

২. এদের মধ্যে 'ফুল পাতানো'র রীতি বর্তমান।

৩.এরা ভোজে মাংস,ভাত আয়োজন করে।

সমাজ অনুশাসন পদ্ধতি : হাড়িদের সমাজে সামাজিক অনুশাসন অত্যন্ত শিথিল। কোনো নারী বা পুরুষ অবৈধ কাজ করলেও তারা সমাজচ্যুত হয় না ।কেউ কোনো অন্যায় করলে সমাজের মোড়লরা তাদের অপরাধের বিচার করেন। হাড়ি সমাজের বয়স্ক ব্যক্তিদের থেকেই মোড়ল নির্বাচিত হয় ।

ট্যাবু বা নিষিদ্ধ : শাল গোত্র ব্যক্তিরা শাল মাছ খায় না।

লোকউৎসব : হাড়িদের প্রধান উৎসব মনসা পূজা।এছাড়াও শীতলা, চড়ক,শিবরাত্রি, টুসু , ভাদু প্রভৃতি লোকউৎসবের আমেজে মেতে থাকে। বর্তমানে এদেরকে করম, জাওয়া, বাঁদ্না উৎসবে অংশগ্রহণ করতেও দেখা যায়।

ভাষা : এরা 'মানভুঁইয়া' ভাষায় কথা বলে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারা : সমাজে হাড়ি জাতি অস্পৃশ্য । নিম্নবর্গের মানুষ বলে চিহ্নিত । সমাজে হাড়িদের সাথে বসে কেউ ভোজন করে না। তাদের ছোঁওয়া জল পর্যন্তও কেউ খায় না।একসময় মন্দির প্রাঙ্গণে ঢুকতে পারতো না। বর্তমানে শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে মানবিকতার স্ফূরণে ও চেতনার প্রসারতায় সমাজে আজ এরা অস্পৃশ্য নয়।

এরা বলিষ্ঠ,কর্মঠ ,কষ্ট সহিষ্ণু জাতি । এরা ছৌ নাচ ও নাটুয়া নাচকে এক উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে গেছে। এই নাচের জন্য এরা বহুজনের কাছে আজও সমাদৃত। এই নাচের জন্যা এদের আয়ের পথ সুগম হয়েছে এবং জীবনে এনেছে আর্থিক স্বচ্ছলতা। সরকারি আনুকূল্যে এই জাতির লোকেরা ক্রমশ উন্নতি লাভ করছে । এদের জীবনধারার পরিবর্তন ঘটেছে।

১০. জালিয়া কৈবর্ত

ভোরের আলো তখনও ফোটে নি । কয়েকজন চলেছে গল্প-গুজব করতে করতে । তারা যাচ্ছে পুকুরের দিকে। কারও হাতে রয়েছে জাল, কারো হাতে খালুই । পুকুরের জলে ভেলা ভাসিয়ে তারা মাছ ধরার তোড়জোড় করছে । এরা জালিয়া কৈবর্ত ছাড়া আর কেউ নয়।

পুরুলিয়া জেলার গ্রামাঞ্চলেই এদের বসবাস বেশি দেখা যায় । পুরুলিয়া শহরের একটি পাড়াতেও এই জাতির লোকেরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে বসতি গড়ে তুলেছে। এদের এলাকা 'জেলেপাড়া' নামে পরিচিত।

নৃতাত্ত্বিক পরিচয় : মাছ ধরা যাদের জীবিকা তাদের বলা হয় 'জালিয়া' বা 'জেলে' । 'জাল' শব্দ থেকে 'জেলে' শব্দটির উৎপত্তি। কারও মতে ' জল' শব্দ থেকে 'জেলে' শব্দটি এসেছে। 'কৈবর্ত' শব্দটি বিশ্লেষণ করলে জানা যায় - 'ক' অর্থ 'জল' এবং 'বর্ত' অর্থ 'জীবিকা'। কারও মতে 'কিবর্ত' থেকে 'কৈবর্ত' শব্দটির উৎপত্তি। 'কিবর্ত'শব্দটির অর্থ নিচু ধরনের জীবিকা । মনুর মতে ' কৈবর্ত বলতে 'মার্গব' বা দাসকে বোঝায়। এর পিতা হল নিষাদ। এবং মাতা হলেন ' আয়োগভী'। 'ব্রহ্মবৈবর্ত' পুরাণ অনুযায়ী এরা ক্ষত্রিয় বাবা এবং বৈশ্য মাতার সন্তান।

কৈবর্ত হল বৃহৎ মৎস্যজীবী গোষ্ঠী। এরা আর্য ও দ্রাবিড় জাতির মধ্যবর্তী স্তরের অন্তর্ভুক্ত। কৈবর্ত জাতি নবশাখ-এর নিচে এদের স্থান। এরা জলচল জাতি। মাছ ধরার কাজে নিযুক্ত গোষ্ঠীকে জালিয়া বা জেলে বলা হয়।

চেহারার বৈচিত্র্য : এদের দেহ সুঠাম,উচ্চতা মাঝারি । ঢেউ খেলানো চুল । এদের দৈহিক শক্তি ও সহনশীলতা প্রচণ্ড।

সামাজিক বিন্যাস : এদের সামাজিক বিন্যাসে উপসম্প্রদায়,গোত্র,পদবি ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়।

ক.উপসম্প্রদায় : এই জাতির মধ্যে দুটি উপ সম্প্রদায় রয়েছে । যেমন- হালিয়া এবং জালিয়া। হালিয়া গোষ্ঠী চাষবাষ করে। এবং জালিয়ারা মাছ ধরে ।

খ. **গোত্র :** কাশ্যপ গোত্র ।

গ.পদবি : এরা কৈবর্ত, জালিয়া কৈবর্ত ইত্যাদি পদবি ব্যবহার করে ।

বাসস্থান : পুকুরের আশেপাশে এরা ঘরবাড়ি তৈরি করে বসবাস করেন । এদের বেশিরভাগ লোক মাটির ঘরে বাস করে। এদের ঘরগুলোর চালা টালি, খাপরা, খড় দিয়ে তৈরি। ঘরের জানালা বিশেষ থাকে না । ঘরের উপরদিকে ছোট চৌকো অথবা গোলাকার ফাঁক থাকে । ঘরে এক পাল্লার কাঠের বা টিনের দরজা থাকে । এদের মধ্যে যাদের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ তারা ঝুপড়িতে বাস করে । এদের ঘরের দেওয়ালে টাঙানো থাকে মাছ ধরার জন্য ঘুনি জাল, ঘুঘি, পলুই ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের মাছ ধরার সরঞ্জাম । ঘরের এককোণে মাছ রাখার খালুই থাকে ।

খাদ্যাভ্যাস : ভাত এদের প্রধান খাদ্য । পুকুরের আলের ধারে বিভিন্ন ধরনের শাক তুলে এনে রান্না করে খায় । মাছ, শামুক, গুগলি প্রতিদিনকার খাদ্য তালিকায় থাকে । এরা পশু-পাখির মাংস খেতে ভালোবাসে । এছাড়াও পিঠে, পায়েস, দই, দুধ ইত্যাদি খায় ।

ব্যবহারিক সামগ্রী : আগে রান্নাবান্না এবং খাওয়া-দাওয়ার জন্য মাটির তৈরি নানা জিনিসপত্র ব্যবহার করতো । যেমন- হাঁড়ি, কড়াই,কলসি ইত্যাদি । বর্তমানে অ্যালুমিনিয়াম, স্টিলের বাসনপত্র ব্যবহার বেড়েছে । এগুলো সহজলভ্য বলে ব্যবহার করে থাকে ।এদের বাড়িতে মাছ ধরার বিভিন্ন সামগ্রী রয়েছে। যেমন- বড়শি, হারপুন, জাল, খালুই, ব্যাগ প্রভৃতি।

সাজ-পোশাক : মাছ ধরার জন্য পুরুষরা গামছা ও ধুতি পরে। অনেকে লুঙ্গিটাকে হাঁটুর ওপরে গুটিয়ে কোমরে বেঁধে নেয়। নারীরা ছাপা সুতির শাড়ি পরে। যুবকরা প্যান্ট, জিন্স, বারমুণ্ডা, গেঞ্জি, শার্ট পরে ঘুরে বেড়ায় । যুবতীরা শালোয়ার কামিজ, চুড়িদার, ফ্রক, স্কার্ট প্রভৃতি পরতে পছন্দ করে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা আধুনিক পোশাক (শার্ট, ট্রাউজার, বারমুণ্ডা) কিনে দেওয়ার জন্য জেদ ধরে ।

প্রসাধন সামগ্রী : মেয়েরা হাতে, পায়ে, মুখে হলুদ বেটে লাগায় । এতে ত্বক উজ্জ্বল দেখায় । এরা তেল, সাবান, শ্যাম্পুর ব্যবহার করে থাকে । বিশেষত নতুন প্রজন্মের কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীরা নিত্য নতুন প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহারের দিকে ঝুঁকে পড়েছে ।

অলঙ্কার : মেয়েরা সোনার ও রূপার কানের দুল আর হাতে কয়েক গাছা চুড়ি পরে। বর্তমানে চিত্র কিছুটা বদলেছে। সোনা আর রূপার অত্যধিক দাম বাড়ায় কম দামি অলঙ্কারের প্রতি এদের সমসজের মেয়েদের আকর্ষণ বেড়েছে। পাথর বসানো ও ইমিটিশানের গয়না এদের অঙ্গে শোভা পাচ্ছে । কাঁচের রঙ-বেরঙের চুড়ি কেনার প্রতি এদের প্রবল আগ্রহ রয়েছে ।

জীবিকা : জালিয়া কৈবর্তদের প্রধান জীবিকাই হল মাছ ধরা। তারা অবসর সময়ে মাছের জাল বুনে । জাল তৈরির জন্য সুতোর পরিবর্তে শন ব্যবহৃত হয়। সেই শনকে শক্ত করতে গাব গাছের গায়ে ঘা মারা হয়। গাঁজিয়ে তোলা হয়। এতে জালের রং গাঢ় বাদামী বর্ণ ধারণ করে। পরে জলে ডোবালে জালের রং কিছুটা কালো হয়। জালকে ভাসিয়ে রাখার জন্য শোলা অথবা বাঁশের টুকরো ব্যবহার করে। তবে কুমড়োর শুকনো খোল হলে ভালো হয়। জালকে ডুবিয়ে রাখার

জন্য পোড়া মাটির অথবা লোহার বল ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও এরা মূর্তিও গড়ে। নারী-পুরুষ পাড়ায় পাড়ায় মাছ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

ধর্ম : সাধারণত এরা হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী। অনেকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত। এঁদের গুরু হলেন 'গোঁসাই'। তাদের পুরোহিত হলেন 'পতিত' বা বর্ণ ব্রাহ্মণ।

দেব-দেবী : শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মহা ধুমধামের সঙ্গে মনসা দেবীর পূজার্চনা করে থাকে। গঙ্গা পূজার সময় জীবন্ত ছাগলছানা গঙ্গা অর্থাৎ পুকুর বা নদীতে বিসর্জন করা হয়। এটা এদের সংস্কার।

এছাড়া এরা গ্রামে গ্রামে বসন্তের দেবী শীতলা ও মা চণ্ডীর পূজা করে। মায়ের পূজায় অন্ন,মিষ্টি,ফল ও অর্থ দান করে থাকে।অনেক সময় এরা মানত রাখে। মানত পূরণ হলে ছাগ বলি দেয়। কাপড় ও অলঙ্কার উৎসর্গ করে থাকে। পৌষ সংক্রান্তিতে এরা বুড়াবুড়ির থানে পূজা দেয়।

লোকবিশ্বাস : জালিয়া কৈবর্তরা বিবাহের সময় তুলসীমঞ্চ জাল দিয়ে ঘিরে রাখে। ভূত-প্রেত থেকে এতে মুক্তি পাওয়া যায় বা রক্ষা পাওয়া যায়- এই লোকবিশ্বাস এদের মধ্যে ছড়িয়ে আছে।

লোকসংস্কার : জালিয়া কৈবর্তরা দৈনন্দিন লোকায়ত জীবনে জন্ম-বিবাহ-মৃত্যুকে কেন্দ্র করে অজস্র লোকাচার মেনে চলেন। যেমন-

ক. জন্ম-সংস্কার : এদের জন্ম-সংস্কারগুলি হল-

১. সাত মাসে প্রসূতিকে 'সাধভাত' খাওয়ানো হয়। সেখানে পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

২. সন্তান জন্মালে ধাই এসে শিশুর 'লাই' কাটে। তারপর ধাইমা আঁতুড় ঘরের মধ্যেই একটি জায়গায় সবকিছু পুঁতে রাখে।

৩. চার দিন পরে প্রসূতিকে ভাত খাওয়ানো হয় ওল দিয়ে। নিরামিষ ভোজন করাতে হয়। এই খাওয়ানোকে 'ঝালভাত' বলে।

৪.সাত দিন পরে 'সিটারা' পাতা হয় যাকে বলে 'ষষ্ঠী পাতা'।

৫. তারপর আট দিনে প্রসূতিকে দুইবার মাছভাত খেতে দিতে হয়।

৬. ন'দিনে 'নরতা' হয়। ঘরে নাপিত ও নাপিত বউকে ডেকে আনে। নাপিত বউ নতুন শাড়ি, চিঁড়ে, গুড়, চাল, আলু, পান, সুপারি, তেল নিয়ে আঁতুড় ঘরে আতপ চাল দিয়ে তেল বসিয়ে রাখে। এরপর পরিবারের সকলকে তেল-হলুদ দেওয়া হয়। তারপর ধাইমাকে সঙ্গে নিয়ে পুকুরে স্নান করতে যায়। প্রসূতি বাপের বাড়ি থেকে দেওয়া নতুন বস্ত্র পরে। বাড়ি ফিরে শিশুকে স্নান করায় আবার পুকুরে গিয়ে একুশটি জায়গায় পূজা করতে করতে বাড়ির দ্বারে এসে দূর্বা ঘাস ও ধান দিয়ে পা ধুয়ে গৃহে প্রবেশ করে। পুকুর থেকে ফিরে এসে মা শিশুকে স্পর্শ করতে পারবে না যতক্ষণ না ভাত খায় এবং বড়দের প্রণাম করে। মন্দিরে ও বড়দের প্রণাম করে মা সন্তানকে কোলে তুলে নেয়।

৭. একুশ দিন পরে হয় 'একুশা'। সেইদিন প্রসূতি স্নান করে শুদ্ধ হয়ে রান্না ঘরে প্রবেশ করতে পারবে। সন্ধ্যা বেলায় পিঠা করে ষষ্ঠী পূজা দিয়ে পিঠা খেতে পাবে।

খ. বিবাহ-সংস্কার : এদের বিবাহ-সংস্কারগুলি হল-

১. বহু বিবাহের প্রথা আছে। বিধবারা দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারে না।

২. বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রচলিত আছে। বিবাহ-বিচ্ছিন্না নারী পুনরায় বিবাহ করতে পারে না।

৩. আশীর্বাদ অনুষ্ঠানের পরেই লগন বাঁধা,আইবুড়োভাত খাওয়ানো হয়।

৪. লগন হাঁড়ি যায় মেয়ের বাড়িতে- গোটা হলুদ নয়টি ,পাঁচটি সুপারি। হরিতকি পাঁচটি, চিঁড়া ন' পাই, গুড় নয় টুকরো, নয়টি লাড্ডু- এইসব দ্রব্য হাঁড়িতে সাজানো হয়। তারপর বরকে হাঁড়ির সামনে পূর্বদিকে মুখ করে বসানো হয়। হাঁড়িটি যে নিয়ে যাবে মেয়ের বাড়ি তার কপালে বর নয় বার ছোঁওয়াবে ।

৫. বিবাহিতা মহিলারা পাতন পেতে বরকে পূর্বমুখে রেখে খই ভেজে বরের আট অঙ্গে হলুদ মাখায়। যে বরকে প্রথম হলুদ মাখাবে সে ন'টি বিরির বড়ি দেবে গামছার মধ্যে। ন'টি দূর্বা ঘাসের মধ্যে সিঁদুর লেপে ঘরের বাইরে দেবে। ন'জন মহিলা লগন ভাঁজে এবং একে অপরকে সিঁদুর দেয়। ওই ন'জন মিলে লগন হাঁড়িটি উনুনে চাপায়। তারপর সকলে মিলে নাপিতের কাছে আলতা পরে নতুন হাঁড়ি নিয়ে স্নানে যায়। ন'রকমের সব্জি মিশিয়ে একটি সব্জি 'পায়েস' করে। তারপর আকন্দ ফুলের মালা গেঁথে বরের গলায় পরায়। বরের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে সাজায় । তারপর একটা ঘট সাজিয়ে তার মধ্যে আমডাল ও ধান দেয়। প্রদীপ জ্বালিয়ে হাতে জাঁতি দিয়ে বরকে খেতে দেয়। কলাপাতায় খাবার দেয় । বরের সাথে ন'জন ছেলে একসঙ্গে বসে খাবার খায়। খাওয়ার পর বরকে কাঁচা দুধে হাত,মুখ ধুতে হয়। বরের নতুন কাপড়ে এক এক করে হলুদ দেয়। তারপর কবিরাজ ডেকে বরের গা বেঁধে দিলে তবেই সে বাইরে বেরোতে পারে।

গ.মৃত্যু-সংস্কার : এদের সমাজে অজস্র মৃত্যু-সংস্কার রয়েছে। সেগুলি হল-

১. মৃতদেহ রাখবার স্থলেই একটি থালায় করে হলুদ জল মাখিয়ে উত্তর দিকে মুখ করে শুইয়ে দেওয়া হয়।পরিবারের সকলে মিলে মৃতদেহের শরীরে হলুদ জল ও তেল মাখায়। কিছু দক্ষিণা দেয়।

২. মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানের উদ্যেশ্যে যাত্রা করে। পুরুষের মৃত্যু হলে স্ত্রীকে হাতের শাঁখা, পলা, লোহার নোয়া খুলে ফেলতে হয় ।

৩. বাড়ি থেকে পুরানো হাঁড়ি, খাপুরি দো মাথায় ফেলা হয়।

৪. ঘর থেকে একটি বড় ভাঁড়ে আতপ চাল, গঙ্গা মাটি,যব ধান,তিল,কড়ি,তুলসী পাতা-সব পুরে নতুন ধুতি পরে ঘরের বড় ছেলেকে সবার পিছনে শ্মশানে নিয়ে যায়। শ্মশানে মৃত ব্যক্তির দেহে ঘি মাখানো হয়। তারপর তাকে উত্তর দিকে মুখ করে শুইয়ে দেওয়া হয়। বড় ছেলে বিপরীত দিকে মুখ করে মুখে তিনবার আগুন দেয়।

৫. শব দাহ করার পর অস্থি বা আটটি হাড় তুলে নিয়ে পিণ্ড দান করা হয়। তারপর সকলে মিলে আটটি অঙ্গেরা আটটি হাড় নিয়ে বাড়ি ফেরে।

৬. ঘরের মেয়ে, বউরা হাঁড়ি ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে পুকুরে স্নান করে আসে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বাড়ির মেয়েরা আকাশে যতক্ষণ না তারা দেখবে ততক্ষণ কিছু খাবে না। আকাশের তারা দেখে ছেলে এবং বউরা ফল, জল সব খাবে।

৭. তারপর দিন অস্থি নিয়ে গঙ্গা যায়। ঘরের মেয়েরা আবার পিণ্ডি দেয়।

৮.চার দিন পরে পুকুরে নিয়ে বেনা গাছ গাড়ার নিয়ম। সেই দিন আবার পিণ্ডি দেওয়ার নিয়ম রয়েছে।

৯.পরিবারের সকলে প্রত্যহ স্নান করে তবে খাবার খেতে পায়। গায়ে তেল,সাবান মাখা চলে না।

১০. চারদিন থেকে নতুন হাঁড়িতে করে একবার দুপুরে সকলে একসাথে গুড় দিয়ে আতপ চালের 'হবিস'(হবিষ্যি) খায় । কিন্তু খেতে খেতে যদি কোনো পাখি,যানবাহনের শব্দ কিংবা কোনো পশুর ডাক প্রভৃতি যেকোনো শব্দ হলে কিংবা কেউ কিছু কথা বললে ,হাসলে আর খাওয়া হবে না। বাড়ির মেয়েরাও খেতে পাবে না। খাবার জলে ভাসিয়ে দিতে হয় । এইভাবে ন' দিন পর্যন্ত চলে।

১১. দশম দিনে ঘাট হয়। সকাল থেকে সবাই উপোস করে থাকে ঘাটে না ওঠা পর্যন্ত। সকালে নাপিতের কাছে চুল,দাঁড়ি,নখ কেটে স্নান করে বড় ছেলে এবং অন্যান্য ভাইরা পিণ্ড দিয়ে মাথা নেড়া করে বাড়ি ফিরে নতুন কাপড় পরে। সেই দিনেও আকাশের তারা দেখে ফলমূল খেতে পারে। তারপর খাবার খায়।

১২. পরের দিন সকালে আবার শ্রাদ্ধের জন্য পিণ্ডি দিতে তিনটি পলাশ পাতার খালা করতে হয়। একটিতে আতপ চাল,তিল,বিরি,যব ধান সাজিয়ে দিয়ে পুরোহিতকে দিয়ে শ্রাদ্ধ করাতে হয়। একটি মাছ,তেলের বাটি, একটি নতুন শাড়ি, কাঁসার বাটি,একটি থালা, ধুতি এইসব নিয়ে বসে তারপর কলা, চাল, বিরি, খাপরা গুড়া, আতপ চাল, তিল, দই মিশিয়ে এক জায়গায় মাখিয়ে ষোল ভাগ করে । তারপর ঘরের তুলসী মঞ্চের সামনে পরিবারের সকলে বসে শ্রাদ্ধের কাজ করে। ষোল ভাগ জিনিসকে একসাথে করে একটি বড় কাঁসার বাটিতে সাজিয়ে একটি মার্কিন ঢাকা দেওয়া হয়। তারপর মাছ ছুঁয়ে পুরোহিতের পায়ে তেল মাখিয়ে শ্রাদ্ধের সবকিছু নিয়ে পুকুরে ভাসিয়ে তেল মেখে স্নান করে বাড়ি ফেরে।

১৩. ঘরের মধ্যে যজ্ঞ করা হয়। ঘরের মধ্যে গাছ থাকলে তা কেটে ফেলা হয়। তারপর যজ্ঞের প্রসাদ খেয়ে নতুন বস্ত্র পরে খাবার খায়। সেই দিন থেকেই জামা পরতে পারবে।

১৪. বাসি শ্রাদ্ধের দিন এরা নাপিতের কাছে মাথা কামিয়ে আর নখ কেটে স্নান করে বাড়িতে আসে। তারপর খাবার খেতে বসে ।

বিবাহরীতি : বিবাহের দিন গায়েহলুদ দেওয়া হয়। পায়ে আলতা পরানো হয়। ডোমকে বাঁদানো হয়। ষষ্ঠী বটতলে পাঁচজন বিবাহিতা মহিলা নিয়ে গিয়ে বাঁদানোর কাজটি করে । এদের কয়েকটি পর্বে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। সেগুলি হল-

ক. গায়ে হলুদ : বরকে তেল,হলুদ মাখানো হয়। গায়েহলুদ মাখানোর রীতি আছে ।

খ. ঘাটপূজা : এরপর মেয়েরা জলসাজতে যায়। সেই সঙ্গে ঘাট পূজার সামগ্রী- আতপ চাল,পান সুপারি,প্রদীপ,ধূপ, একটি হাঁস ডিম, হলুদ,তেল সাথে নিয়ে যায়। মা পুকুরে স্নান করে জল কাপড়ি দিয়ে পূজা করে।

এরপর বাড়িতে ফিরে ছাদ্নাতলার গন্ধেশ্বরী থালায়-এক থালা সিঁদুর,১টি পোয়া,১টি কাজললতা, ২৫টি পান, সুপারি,হলুদ গাঁটা, বিরি কলাই,ঘুঘুড়, সিঁদুর,আমলা-বাসলা, তুলসীপাতা,যব,ধান,পিঠালি বাটা, গঙ্গা মৃত্তিকা, ২১টি খালা, শাঁখা ভাঙ্গা, হলুদ জল,ইঁদুর মাটি, নয়টি কাঁঠাল পাতার খাড়ি সুতোয় বাঁধা, মাচা ডালি,লাটাই,ভাত কাপড় নান্নিমুখের ভাত কাপড়,হাতে সুতালি বাঁধা প্রভৃতি একুশ রকম জিনিস সাজানো হয়। এগুলি সিঁদুর দানের সামগ্রী। মেয়ের বাড়ি পাঠানো হবে । এরপর নান্নিমুখ অনুষ্ঠানটি পালন করা হয়।

গ. নান্নিমুখ : মা,বাবা এক আঁজলা বরের হাতে আলোচাল একটি পান ও সুপারি দিয়ে জামাইদাদা বাবা,কাকা নান্নিমুখ করে। বামুন মন্ত্র পাঠ করে। চালের মুঠো নিচ থেকে আলগা ছেড়ে দেয়। হাতটা বরের কপালে ছোঁওয়ায়। বাবা নিচে বসে বর পিঁড়িতে বসে। দণ্ডবৎ (প্রণাম) করে হাতে সুতলি বেঁধে দেয়। বরের গলায় আকন্দ ফুলের মালা , সুপারির মালা পরিয়ে দিতে হয়। বরকে সাত খিরির আর কনের জন্য নয় খিরির মালা তৈরি হবে। মালা বদলের সময় দুটি অদল-বদল হবে।

ঘ. বসুধারা : মা নতুন বস্ত্র পরে আলোচাল,পান ,সুপারি ও প্রদীপ নিয়ে বরের কপালে ছোঁয়ায়। বামুন থালায় ঘি নিয়ে মন্ত্র পড়ে আর ঘি ঢালতে থাকে। বরের মাথা নামানো থাকে কাছে মা আঁচল পেতে থাকে।বসুধারা একটা খুঁটে বাঁধে। বরকে সাজিয়ে বাইরে বের করে হলুদ জলে পা ধোওয়ায়। এরপর ন'বার আমডগ চিবিয়ে মায়ের দুগ্ধ পান করে বিয়ে করতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। মুকুটটা একটু ছিঁড়ে দিতে হয়। তেল, সরা, নান্নিমুখের সাজ,আয়না,চিরুনি- সব নিয়ে কনে বাড়ি যাওয়ার জন্য তৈরি হয়।

ঙ. বর বরণ : বর গাড়ি থেকে নামবার আগে বর অভিমান করে খেতে চায় না। শাশুড়ি গুড়, জল বা মিষ্টি খাওয়ায় ।শ্বশুর কোলে করে বরকে ঘরে নিয়ে যায়। মামারা জল ঘটি ধরে আলিঙ্গন করে।

নান্নিমুখ হবে মেয়ের। বরের বাড়ি থেকে আনা নান্নিমুখের সামগ্রী-বিরি,একটি জায়ফল,ষোল আনা,১টি হরিতকি, পাঁচটি সুপারী, পাঁচটি হলুদ গাঁটা, পাঁচটি কড়ি, এলাচ, লবঙ্গ একটি কাপড়ে সবগুলো বাঁধতে হবে। সিঁদরা দানের সিঁদুর কৌটো থাকবে। বাবা, কাকা জ্যেঠা নান্নিমুখ করল, হাতে সুতলি বাঁধবে বামুন ঠাকুর।

চ. বিবাহ অনুষ্ঠান : বরকে ছাদ্না তলায় নিয়ে যায়। আলোচালের ভুজ্যি,চিঁড়ার ভুজ্যি,ভাতের চালের ভুজ্যি,আলু,পান সুপারী,পৈতা ডালায় সাজায়। মেয়েদের ক্ষেত্রে বরের ঘরের পান সুপারি দিয়ে ভুজ্যি দিতে হয় এবং মেয়ের বাপের ঘরের ও শ্বশুর ঘরের পাঁচ বা সাত পুরুষের নাম বলে।

ছ. মালাবদল : বর কনে ছামড়া তলায় (ছাদ্না) এসে কনেকে বাচা ডালিতে বসিয়ে তিনবার ঘোরায় । মেয়ের মুখ পূর্ব দিকে আর বরের পশ্চিমে দিকে মুখ করে মালা বদল হয়। কনেকে ছেড়ে দিলে কনে দৌড়ে ঘরে লুকাতে যায়। শালা দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে। জামাই ছোট গামছা এবং বরকে নিয়ে যায়। বর ঘরের মধ্যে গিয়ে কনেকে স্পর্শ করে এবং ফিরে ছাদ্না তলায় বসে। এরপর হস্তবন্ধনের পালা ।

সিঁদুর দানের সামগ্রী সাজানোর আয়োজন চলে। পুরোহিত মন্ত্র পড়তে থাকে। বাপের ঘর,মামা ঘর, আত্মীয় স্বজন সবাই দান দক্ষিণা দেয়। গোরু-বাছুর ,অন্ন বরকে দান করবে কিনা জিজ্ঞাসা করে। পঁচিশ সের ধান দেবার প্রতিশ্রুতি দেয় । মধু পক্ক অনুষ্ঠান হয়।

জ. সিঁদুর দান : সিঁদুর দান অনুষ্ঠান শুরু হলে বরের জ্যেঠা,কাকা সবাই চলে যায়। আত্মীয় স্বজন থাকতে পারে না। পোয়া দিয়ে সিঁদুর দিতে হয়। বর তিনবার কনের মাথার কাপড় সরিয়ে সিঁদুর দেয়।তারপর মাথায় লজ্জাবস্ত্র দিয়ে ঢেকে

দেয়। ঠাকুরকে প্রণাম করে। দক্ষিণা দেয়। ছাদ্না তলায় ফুল,চাল ছড়ায়। তারপর বর ও কন্যাকে কোলে করে ঘরে প্রবেশ করানো হয়। সিঁদুর দানের পর মেয়েকে মায়ের সাথে মাছ ভাত খেতে হয়। বর বাবার সাথে খাবার খায়। তারপর 'বাঁদানি' অনুষ্ঠানটি পালিত হয়।

ঝ. বাঁদানি : সকালে বাঁদানি বসে। কনে ঘটের ঢাকনাগুলি খুলে চাল নাড়তে নাড়তে যায় আর বর ঘটের ঢাকনাগুলি লাগিয়ে লাগিয়ে যায়। পরেরবার বর ঘটের ঢাকনা খুলে চাল নাড়তে নাড়তে যায় আর কনে ঢাকনাগুলি লাগিয়ে লাগিয়ে যায়। এইভাবে পাঁচ,সাত পাক করতে হয়। এরপর কাপড় ছোঁড়াছুঁড়ি হয়। কাজল, জাঁতি লুকালুকি খেলা চলে। জলের মধ্যে পা ধোওয়ানো হয়। তারপর মেয়েকে তার মা দুগ্ধপান করিয়ে বিদায় দেয়।

ঞ. মুখ দেখাদেখি : বর-কনেকে গাড়ি থেকে নামানোর আগে বরের মা,কাকি,মাসি,পিসি গাড়ির চারদিকে ন' পাক ঘোরে। খই ছড়ায়। এরপর বউয়ের হাতে লোহার বালা পরানো হয়। বরণ করে কোলে করে বর -বউকে ছামড়া তলায় আনা হয়। ধান ছড়ানো হয়। বর-বধূ ঘরে প্রবেশ করে।

সামাজিক রীতিনীতি : এদের সমাজের সামাজিক রীতিনীতিগুলি হল-

১. আগে মেয়েরা তিন বছর হলেই তাদের বিয়ে দেওয়া হোত।বাল্যবিবাহ রীতি ছিল।

২. মেয়েরা প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত তারা বাপের বাড়িতেই থাকত। শ্বশুরবাড়িতে যেত না।

৩. কনের জন্য পণের জোগাড় না করা পর্যন্ত ছেলেদের বিয়ে দেওয়া হতো না । বহু বিবাহের চল আছে ।

৪. বিবাহ-বিচ্ছিন্না নারী,বিধবা রমণী পুনরায় বিবাহ করতে পারে না । একসময় উচ্চ সম্প্রদায়ের লোকেরা এদের হাতের ছোঁওয়া জল খেতো না। তবে এখন আর এদৃশ্য চোখে পড়ে না ।

৫. পিতা-মাতার মৃত্যু হলে কোনো জেলে মাছ ধরতে যায় না। পুরোহিতের অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত সে মাছের ব্যবসাও করে না।

সমাজ অনুশাসন পদ্ধতি : কৈবর্ত সমাজের সমাজপতি সমাজের বিচার ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করেন। বিবাহের দেনাপাওনার বিষয় ঠিক করেন সমাজপতি। তার কথামতো সবাইকে চলতে হয় । শুধু তাই নয়, পূজা-পার্বণ, উৎসব-অনুষ্ঠান ইত্যাদির জন্য তার পরামর্শ ও নির্দেশ ঐ সমাজের সকলকে মেনে চলতে হয় ।

ট্যাবু বা নিষেধাজ্ঞা : এরা কচ্ছপ খায় না ।

লোকউৎসব : জালিয়া কৈবর্তদের প্রধান উৎসব মনসা পূজা। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিন তারা মহা ধূমধাম করে মনসা পূজা করে । পুজোয় হাঁস ও ছাগল পাঁঠা বলি দেয়। মাঘ মাসের পয়লা থেকে 'জাল পালনি' নামে এক লোকউৎসবের আয়োজন করে। এটা সাতদিন ধরে উদযাপিত হয়। এই সময় এরা মাছ ধরে না । নদীর ধারে জাল ছড়ানো থাকে এবং লাল রঙে রঙিন করা হয় । এ ছাড়াও তারা গাজন পরব, রহিন উৎসবে অংশগ্রহণ করে।

ভাষা : এরা ' মানভুঁইয়া' ভাষায় কথা বলে ।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারা : মৎস্যজীবী হিসাবে সমাজে এরা পরিচিত । অস্পৃশ্য না হলেও অন্যান্য জাতির মানুষদের থেকে এরা একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলে । ঝড়,বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে জীবিকার তাগিদে এই জাতির পুরুষ

ও মেয়েরা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সাপখোপ, ভূত-প্রেতকে ভয় না করে জীবন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার দৃঢ় মানসিকতা এদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাব, দুঃখ-কষ্ট,এদের মানসিক শক্তিকে খর্ব করতে পারে নি । এদের মধ্যে আর্থিক স্বচ্ছলতা আনার জন্য সরকার নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

১১. কেওট

সেদিন ছিল রবিবারের সকাল । চায়ে চুমুক দিতে দিতে পথপানে উদাসভাবে চেয়ে রয়েছি । ভাবছি অন্য জগতের কথা। হঠাৎ ' মাছ লিবে নাকি গো ? মাছ'-এমন আওয়াজ আমার কানে ভেসে এলো। চোখে পড়ল এক বৃদ্ধা ঝুড়ি ভর্তি নানা ধরনের মাছ নিয়ে এদিকে আসছে। মাছ নেব বলে তাকে ডাকলাম। মাছ বেচতে বেচতে সে আমাকে জানাল তার নাম লক্ষ্মী ধীবর। তারপর জানতে পারলাম এই 'ধীবর' পদবি যে জাতির লোকেরা ব্যবহার করে সেটি হল কেওট। নিতুড়িয়া, পারবেলিয়া,সুরুলিয়া,কলাবনি,লুধুড়কা ইত্যাদি বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে রয়েছে এদের বসবাস। 'কৈবর্ত' শব্দ থেকেই 'কেওট' শব্দের উৎপত্তি। এরা সাধারণত কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়।

নৃতাত্ত্বিক পরিচয় : আমরা জানি , কৈবর্ত হল আর্য ও দ্রাবিড় জাতির মধ্যবর্তী স্তরের অন্তর্ভুক্ত। তাই আর্য ও দ্রাবিড় জাতির কিছু বৈশিষ্ট্য কেওট জাতির মধ্যে বর্তমান। বর্তমানে কেওট একটি পৃথক জাতি রূপে পরিগণিত হয়েছে। এদের সম্পর্কে কিংবদন্তি রয়েছে। সেটি হল দ্বারভাঙ্গার রাজার ব্যক্তিগত ভৃত্য ছিল কুর্মিরা। তাদের একজনের নাম ছিল বীরু খাওয়াস। সে তহশিলদার ছিল। কিন্তু সে রাজার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। এর ফলে রাজা সমস্ত কুর্মিদের বহিষ্কার করেন তার রাজ্য থেকে এবং উত্তর-পশ্চিম থেকে কেওটদের এনে নিজের রাজ্যে তাদের বসতি গড়ে তোলেন।
রাজার ব্যক্তিগত ভৃত্যকে 'খাওয়াস' বলা হোত। শস্য ভাণ্ডার রক্ষণাবেক্ষণকারীকে 'ভাণ্ডারী' বলা হোত। রান্নাঘর পরিচালনার দায়িত্বে থাকত ' দেরাদার' । রাজার জামা-কাপড় দেখভাল করার জন্য রয়েছে' কাপর' এবং ব্যক্তিগত জমিতে চাষবাস করতো 'কামৎ'।

চেহারার বৈচিত্র্য : এদের আকৃতি মাঝারি। মাথা লম্বা , নাক ছোট। দেহ বলিষ্ঠ ও ভারী। এদের গায়ের রঙ কালো।

সামাজিক বিন্যাস : এদের সামাজিক বিন্যাসে উপসম্প্রদায় ,গোত্র ও পদবি চোখে পড়ে।

ক. উপসম্প্রদায় : কেওট জাতির মধ্যে পাঁচটি শ্রেণি বা উপগোষ্ঠী রয়েছে। সেগুলো হল-

১) অজুধিয়াবাসী ২) বহিয়াওক,বহিয়ৎ বা ঘিবিহার ৩) গরভাইত, গোরোয়াইৎ, সাঘার ৪) জাথোট এবং ৫) মাছুয়া।

খ.গোত্র : এদের কাছে জানতে পারলাম সে শঙ্খ গোত্রের কেওট। অন্যদের গোত্র হল শঙ্খঋষি।

গ. পদবি : সে জানাল তার পদবি ধীবর হলেও অন্যদের পদবি সিকদার, দিগার প্রভৃতি।

বাসস্থান : এদের আর্থিক অবস্থা ভালো নয় । এদের ঘর মাটির ও পাথরের তৈরি । বেশিরভাগ খড়ের ছাউনি । কয়েকটা বাড়ি খাপরা ও টালি দিয়ে ছাওয়া। ঘরগুলোর দরজা ছোট। মাথা নিচু করে ঢুকতে হয়। জানালা নেই বললেই চলে। শুধু ছোট একটা ঘুলঘুলি থাকে। কয়েকজনের অবস্থা একটু ভালো। কেওটদের মধ্যে যারা সঙ্গতিহীন তাদেরকে বাস করতে হয় ঝুপড়িতে। গাছের ডালপালা ,পাতা দিয়ে সেগুলো ছাওয়া। কেউ খাটিয়েছেন ত্রিপল, পলিথিনের তাঁবু-তা দড়ি দিয়ে আটকানো।

খাদ্যাভ্যাস : কেওট জাতির লোকেরা দুবেলা ভাত খায় । ভাতের সঙ্গে থাকে মাছ, মাংস , ডিম। সব্জি খুব কম পরিমাণে খায়।এরা প্রধানত হাঁস ,পায়রা, মুরগির মাংস খেয়ে থাকে । এরা মদ,ভাঙ,গাঁজার নেশা করে ।

ব্যবহারিক সামগ্রী : একসময় কেওটদের দৈনন্দিন কাজের জন্য মাটির তৈরি জিনিসপত্র ব্যবহার করতো । মাটির হাঁড়ি,কড়াই,কলসি ইত্যাদি সস্তা ও সহজলভ্য বলে কেওটদের মধ্যে এগুলির প্রচলন ছিল বেশি । কিন্তু বর্তমানে স্টিল, অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি,কড়াই,বালতি ইত্যাদি বাসনপত্র ব্যবহার করে। টাকাপয়সা, গয়না , কাপড়চোপড় রাখার জন্য তারা ব্যবহার করে টিনের ছোট তোরঙ্গ । মাছ ধরার বিভিন্ন ধরনের জাল ,খালুই ইত্যাদি তারা ঘরের এককোণে বা দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখে ।

সাজ-পোশাক : কেওট জাতির পুরুষেরা ছোট ছোট ধুতি হাঁটুর ওপর পরে । গায়ে দেয় জামা ও ফতুয়া । মাথায় বাঁধে গামছা । কেউ কেউ ধুতিকে লুঙ্গির মতো করে পরে । মেয়েরা ছাপা সুতির শাড়ি পরে। এরা মাছ বেচতে যাওয়ার সময় সাপটা দিয়ে শাড়ি পরে । আঁচল তাদের কোমরে জড়িয়ে নেয় । মাথায় ঘোমটা টেনে গামছার পাগড়ি বানিয়ে মাছের ঝুড়ি চাপায় । এদের সমাজের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে আধুনিক হাল ফ্যাশানের পোশাক পরতে দেখা যায় ।

প্রসাধন সামগ্রী : এদের সমাজের মেয়েরা তুলসী এবং চন্দন বেটে মুখে লাগায় । ত্বক ফর্সা ও উজ্জ্বল হয় ।
বাজারের চলতি স্নো-পাউডার তরুণীদের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলে। রঙিন ফিতে, ক্লীপ দিয়ে চুল বাঁধে । তেল,শ্যাম্পু,সাবান এরা ব্যবহার করে থাকে ।

অলংকার : কেওট রমণীদের গলায় সরু হার, কানে ছোট ছোট দুল আর হাতে সরু সরু দুগাছা বালা দেখতে পাওয়া যায়। এরা এখন নকল সোনার গয়না পরে । সোনার দাম নাগালের বাইরে । তাই রূপোর,ইমিটিশানের গয়না পরে ঘুরে বেড়ায়। বয়স্ক মহিলারা পেতলের বালা,কানের দুল পরেন। বিবাহের সময় মেয়েকে সোনার ও রূপার গয়না দেওয়ার চলন রয়েছে ।

জীবিকা : কেওট জাতির লোকেদের প্রধান জীবিকা মাছধরা । তাই এরা মৎস্যজীবী । এই জাতির মেয়েরা পুরুষদের সাথে মাছ ধরে ও মাছ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে । এদের মধ্যে কেউ কেউ চাষবাস করে । তাই তারা কৃষিজীবী । নৌকা চালানোকে পেশা হিসাবে কেউ কেউ বেছে নিয়েছে । এদের পেশাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে 'মাছুয়া ' সম্প্রদায় । প্রয়োজনের তাগিদে এই জাতির কেউ কেউ দিনমজুরের কাজ, রিক্সা চালানো , টোটো চালানো ইত্যাদি ছোট খাটো কাজকে পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছে।

ধর্ম : কেওটরা হল হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ। মৈথিল ব্রাহ্মণরা এদের সমাজের পুরোহিত। কেওটদের গুরু হলেন সন্ন্যাসী । এদের যে কোনো অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করে ব্রাহ্মণরা।

দেব-দেবী : মা মনসা এদের কুল দেবী। প্রতিদিন মনসার পূজার্চনা করা হয়। এছাড়া এরা শীতলা,শিব, ধর্ম ঠাকুরের পূজা করে । দেবী ভগবতীর আরাধনা করে । কেউ কেউ টুসু,ভাদুর পূজা করে থাকে ।

লোকবিশ্বাস : এরা বিশ্বাস করে মনসা দেবীকে হাঁস বলি দিলে সাপের উপদ্রব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এরা ভূত-প্রেত, ডাইনি ইত্যাদি বিশ্বাস করে । শিশুদের জ্বর-জ্বালা হলে ঝাড়ফুঁকে বিশ্বাস করে । অন্যের কুদৃষ্টি থেকে শিশুদের রক্ষা করার জন্য এরা মাছ ধরার জালে ব্যবহৃত জালকাঠিটিকে তারা 'নজরকাঠি' হিসাবে ব্যবহার করে ।

লোকসংস্কার : এদের সমাজে রয়েছে অজস্র লোকসংস্কার। বিশেষ করে জন্ম,বিবাহ ও মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সংস্কারের জগৎ এদের সমাজে আবর্তিত হয় । তা হল-

ক. জন্ম সংস্কার :

১. আগে শিশু ঘরে জন্মালে ঘরের চালায় লাঠি দিয়ে আওয়াজ করতো।

২. এখন শিশু হাসপাতালে জন্মগ্রহণ করে। তাই অনেক নিয়ম কেওটরা পালন করতে পারে না। শিশু সন্তান জন্মানোর চার দিন পর প্রসূতিকে 'ঝালভাত' খাওয়ানো হয়। ধাইমা এসে শিশু ও প্রসূতির যত্ন নেন।

৩. এরপর নয় দিনে তেল-হলুদ দিয়ে 'লত্তা' বা 'লরাত' অনুষ্ঠান পালন করে। পরিবারের অশৌচ কাটে। নাপিত আসে সকলের নখ,চুল কাটে। পুরুষদের দাঁড়ি কামায়। ষষ্ঠী বটতলায় ধাইমা পিঠে আর মিষ্টি দিয়ে পূজা দেয়।

৪. আবার একুশ দিনে 'একুশা' পালন করে। ন' দিনে কেউ যদি ষষ্ঠীমাকে পূজা দিতে না পারে তাহলে একুশার দিন ষষ্ঠী বটতলায় পূজা দেয়। প্রসূতি রান্না ঘরে ঢুকবার প্রবেশাধিকার পায়।

৫. ছেলের ছয় মাসে মুখে ভাত আর মেয়েদের সাত মাসে মুখে ভাত হয়। শিশুকে প্রথমে নিজের বাড়ির ভাত খাওয়ানো হয়। তারপর তাকে মামাবাড়ির ভাত খেতে দেয়।

খ. বিবাহ সংস্কার :

১. আগে পাত্ররা পণ দিয়ে কনেকে নিয়ে আসত। বর্তমানে পাত্রপক্ষ পণ নেয়।

২. বিবাহের প্রাথমিক পর্বে বরের ঘরের লোক প্রথমে পাত্রীপক্ষের বাড়িতে উপস্থিত হয়। একে বলে 'ঘর দেখি'। পাত্রীকে দেখাই মূল উদ্দেশ্য। এরপর মেয়ের বাড়ির লোক পাত্রের বাড়ি দেখতে যায়। এই প্রথাকে বলে ' বরদেখি'। বরকে দেখাই মূল উদ্দেশ্য।

৩.এরপর 'তিলক' অনুষ্ঠানটিতে কনের বাবা বা অভিভাবক টাকা, কাপড়-চোপড় নিয়ে বরের ঘরে যান। 'তিলক' দেওয়ার পর তিরহুতিয়া ব্রাহ্মণকে ডেকে বিয়ের জন্য ভালো দিন স্থির করা হয়। এরপর লগন বাঁধা হয়।

৪. বিবাহের পূর্ব দিন 'কুমরম' বা 'মটকোরওয়া' বর-কনের আত্মীয়রা মিলে অনুষ্ঠান করে। পুকুরে বর-কনের দুই পরিবারের গান গাওয়া চলে। স্নানের পর বর অথবা কনের মা বা আত্মীয় মাটির তাল খুঁড়ে নিয়ে আসে। এই মাটি দিয়ে উনুন তৈরি হয়। এই উনুনে ঘি পোড়ানো হয়। ধান থেকে চিঁড়ে বানানো হয়। এগুলো গৃহদেবতাকে উৎসর্গ করা হয়। যে ঘরে বাস করে সেই ঘরেই এসব করতে হয়। এ সময় ছাগল ও উৎসর্গ করা হয়।

৫. পরের দিন ব্যবহারের জন্য কিছু চিঁড়ে রেখে দেওয়া হয়। বিয়ের আগের দিন ছেলে এবং মেয়েকে তেল-হলুদ মাখানো হয়। আইবুড়ো ভাত খাওয়ানোর দিন আকন্দ ফুলের মালা পরে।

গ. মৃত্যু সংস্কার :

১. কৈবর্তদের মতোই কেওটদের দশ দিনে ঘাট হয়। এগারো দিনে শ্রাদ্ধ হয়।

২. পলাশ ডালে সাদা শালুতে ঘি মাখিয়ে বাম হাতে মুখাগ্নি করা হয়।

৩. শ্মশানে কাঠে পোড়ানো হয়। পরে জল ছিটিয়ে আগুন নিভিয়ে দেয় ।

৪. আট অঙ্গের হাড় নিয়ে সাদা কাপড়ে বেঁধে গলায় বেঁধে নিয়ে আসে। ত্রিবেণীতে বিসর্জন দেয়।

৫. চার দিনের দিন পুকুর পাড়ে বেনা গাছ গাড়ে।

৬. চার দিন কিংবা পাঁচ দিনে হবিষ্যি দেওয়া হয়। নয় দিনের দিন দিনের বেলা ও রাতের বেলা দুবার হবিষ্যি করা হবে। আট দিনের দিন গাছে জল দেয় না।

৭. দশ দিনে বাড়ির সবাই ঘাটে ওঠে। নতুন কাপড় পরে। মাছ বাড়া হয়।

বিবাহরীতি : বিয়ের আগের দিন বর ও কনের বাড়িতে গায়েহলুদের অনুষ্ঠান হয় । বিয়ের দিনে উভয়ের বাড়িতে বিয়ের প্রস্তুতি চলে । কনের বাড়িতে বিয়ের দিন সকালে সিধা ডাল,মহুল ডাল,আম ডাল পোঁতে। আমপাতার মালা করে ছাদ্‌নাতলা সাজায় ।

আমলা-বাসলা দিয়ে বাঁধের ঘাটে পূজা করে। জল সেজে আনার পর ডোবার মতো খুঁড়ে কনেকে স্নান করানো হয়। সন্ধ্যাবেলায় বর এলে মা ও পরিবারের অন্যান্য এয়োস্ত্রীরা বরকে বরণ করেন। মিষ্টি মুখ করান। বাবা বা জামাইবাবু কোলে করে ছাদ্‌নাতলায় নিয়ে আসে। বরের চারপাশে সাততী ঘোরা হয়। কনেকে পিঁড়িতে বসিয়ে ছাদ্‌না তলায় নিয়ে আসে। বরের চারপাশে ঘোরানো হয়। কাপড় ঢাকা দিয়ে মালাবদল করা হয়। প্রথমে আকন্দ ফুলের ও পরে রজনীগন্ধা ফুলের মালাবদল করে। পুরোহিত বর ও কনের নাম দুটো আমপাতায় লিখে দুজনের হাতে বেঁধে দেয়। তারপর হস্ত বন্ধন করা হয়। লোহার জাঁতি দিয়ে কনের মাথায় সিঁদুর দান করে। এরপর বর-কনেকে ঘরে বসানো হয়। মিষ্টি,জল খেতে দেওয়া হয় । তারপর শুরু হয় ছামানি ভাঁড় নাড়ানো অনুষ্ঠান হয়। পরে বসে বান্দাপণ । তারপর কনে চাল দিয়ে ঘর ভরে বিদায় নেয়।

সামাজিক রীতিনীতি : সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। বহু বিবাহ প্রচলিত আছে। প্রথম স্ত্রীর সন্তান না হলে স্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারে। তবে দুটির বেশি বিয়ে করতে পারে না। বিধবারা পুনরায় বিবাহ করতে পারে। সেই পরিবার বা অন্য কোনো পরিবারের পুরুষ হতে পারে। বিবাহ-বিচ্ছেদ এই সমাজে নিষিদ্ধ। স্বজাতি ছাড়া অন্য জাতির ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বিবাহ চলে না ।

সমাজ অনুশাসন পদ্ধতি : সমাজ অনুশাসনের দায়িত্ব ছিল কেওট সমাজের মোড়লদের হাতে। মোড়লরা 'হাজারগড়্যা'নামে পরিচিত ছিল । বর্তমানে গ্রামের প্রধান গ্রাম-পঞ্চায়েতে বসে সমাজের নিয়ম কানুন ঠিক করেন। এছাড়াও রয়েছে 'ধীবর সমিতি' । ধীবর সমিতির উদ্যোগে এবং পরিচালনায় পুরুলিয়া জেলার বিখ্যাত রাসমেলা ও জেলেপাড়ার দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এখনও কিছু কিছু গৃহে রক্ষণশীল ও বয়স্ক ব্যক্তিরা সমাজের পুরনো রীতিনীতিকে আজও ধরে রেখেছেন ।

ট্যাবু বা নিষেধাজ্ঞা : কেওটরা সাপ মারে না। শঙ্খ গোত্রের বিবাহিতা নারীরা শঙ্খ নির্মিত শাঁখা পরবে না । তবে তারা গালা ও প্লাস্টিকের শাঁখা পরে থাকে । এই গোত্রের ব্যক্তিদের শাঁখ বাজানো নিষিদ্ধ। তবে বিবাহের পর অন্য গোত্রের মেয়েরা শাঁখা পরতে পারে।

লোকউৎসব : কেওটদের প্রধান উৎসব হল মনসাপূজা । তারা সর্পদেবী মনসার ধুমধাম করে পূজা করে । শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন পূজার আয়োজন করে। হাঁস,পায়রা ও ছাগল পাঁঠা বলি দেয়।এছাড়া তারা শীতলা, ধর্ম, ভাদু ইত্যাদি

লোক দেব-দেবীদের পূজা দেয়। বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গ্রাম দেবতার পূজার্চনা করে। পূজা উপলক্ষে জমে ওঠে উৎসব-পার্বণ। এইসব লোকউৎসব-পার্বণে এরা স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণাবেগে অংশগ্রহণ করে।

ভাষা : প্রধানত এরা 'মানভুঁইয়া' ভাষায় কথা বলে। তবে এখন মার্জিত ভাষায় কথা বলতে এরা অভ্যস্ত।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারা : সমাজে এদের স্থান কিছুটা উচ্চে। ব্রাহ্মণরা এদের হাতে জল পান করেন। ফল, মিষ্টান্ন গ্রহণ করেন। কুর্মি,ধানুক,কৈরিস জাতির মতো সমমর্যাদা সম্পন্ন। কেওটদের জীবনযাত্রার মান অতি সাধারণ। আর্থিক দৈন্যদশায় এরা জর্জরিত। অভাব-অনটনের আঘাতে এরা ক্ষত-বিক্ষত। নিজেদের জীবিকার ভিত্তিতে সংসার প্রতিপালন করা খুব কষ্ট সাধ্য। তাই সংসারের সকলের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য নানা পেশা বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। এখানকার লোকসমাজ ও মৎস্যজীবীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এদের রুজি রোজগারের পথ খুলে গেছে। এতে তাদের সংসারে ফিরছে আর্থিক স্বচ্ছলতা।

১২. মাল

পুরুলিয়ার বনে-বাদাড়ে, ঝোপে-ঝাড়ে এক শ্রেণির লোককে সাপের খোঁজে ঝাঁপি নিয়ে ঘুরতে দেখা যায়। তারা সাপ ধরতে, মন্ত্রবলে সাপকে বশীভূত করতে এবং সাপের খেলা দেখাতে বিশেষ দক্ষ। সকলের কাছে এরা ' মাল' জাতি নামে পরিচিত।

নৃতাত্ত্বিক পরিচয় :দ্রাবিড় গোষ্ঠীভুক্ত কৃষিজীবী সম্প্রদায়। এই জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। কারো মতে ঢাকার নবাবের সভায় মল্ল যুদ্ধ করতে পারদর্শী ছিল বলে এদের 'মাল' বা 'মল্ল' বলা হোত।

মলভূমি (মানভূম) অঞ্চলে [মল্লদের দেশের পরিবর্তে] মন্ স মল্লুস এবং মালদের বাস। মালদের সম্ভবত পূর্বদিকে বিতাড়িত করা হয়, তারা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে এবং পরবর্তী কালে হিন্দুদের নিম্নশ্রেণির সঙ্গে মিশে যায়। অনেকের মতে মল ও চণ্ডাল অভিন্ন জাতি। আবার কেউ বলেন মালরা মল্ল যোদ্ধা, কেউ বলেন সাপুড়ে।

চেহারার বৈচিত্র্য : মাল জাতির মানুষদের আকৃতি মাঝারি, মাথা লম্বা, পাতলা গড়ন, গায়ের রঙ চিকন কালো, নাক ছোট। শারীরিক কাঠামো দেখলে বোঝা যায় সমাজের কোনো আদিবাসী গোষ্ঠী থেকে এদের উৎপত্তি।

সামাজিক বিন্যাস : এদের সামাজিক বিন্যাসে উপসম্প্রদায়,গোত্র ও পদবি-এর কথা জানা যায়। যেমন-

ক. উপসম্প্রদায় : মালদের সবচেয়ে প্রাচীন রূপটি বাঁকুড়ায় বসবাস করে। এই জেলায় রয়েছে ধুনকাটা, রাজবংশী,সাপুড়িয়া বা বেদ্য-মাল এবং তুংগা। ধুনকাটা মাল শাল গাছ থেকে ধুনা সংগ্রহ করে। তুংগা উপগোষ্ঠী চাষবাস করে। সাউরিয়া বা বেদ্য-মাল সাপ খেলা দেখায়। বানর ধরে। ছোট ছোট তাঁবু নিয়ে একস্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াতো। ভোগবাজির খেলা দেখাতো।

খ. গোত্র : মাল জাতির দুটি গোত্র- কচ্ছপ ও শূকর।

গ. পদবি : শেকরা, ঠেঁটরি ও মাল- এই তিনটি পদবি মালদের মধ্যে প্রচলিত। তবে পুরুলিয়ায় মাল পদবিধারী লোকেদের বাস বেশি।

বাসস্থান : মাল জাতির অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করে। তাদের ঘরবাড়ির আকার ছোট ছোট।খুব বেশি উঁচু নয়। এদের ঘরের দেওয়াল পাথর ও মাটি দিয়ে তৈরি। ঘরের চালা গুলো ছাউনি দিতে লাগে গাছের ডালপালা, খড়, টালি ও খাপরা।

খাদ্যাভ্যাস : মাল জাতির লোকেরা দুবেলা ভাত খেয়ে জীবন ধারণ করে। এরা মাছ ও মাংস খেতে খুব ভালোবাসে। এরা গো মাংস,শূকর মাংস না খেলেও মেঠো ইঁদুর ও গোসাপের মাংস খায়। পাখির মাংস এরা বেশি পছন্দ করে।

ব্যবহারিক সামগ্রী : কাঁসা, পিতলের বাসনপত্রের চলন কমে গেলেও তাদের ঘরে কাঁসা-পিতলের থালা,বাটি,ঘটি,গ্লাস ইত্যাদি জিনিসপত্র দেখা যায়। পানীয় জল রাখার জন্য তারা মাটির হাঁড়ি,কলসি,কুঁজো কেনে। কেউ কেউ রান্না করা ও খাবার খাওয়ার জন্য হাল্কা স্টিল ও অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র ব্যবহার করে থাকে। এদের ঘরে ছুরি, কাঁচি, কুঠার, কুড়ুল প্রভৃতি লোকঅস্ত্র দেখা যায়।

সাজ-পোশাক : পুরুলিয়ার মাল জাতির বয়স্ক লোকেরা বেশিরভাগ খাটো ধুতি পরেন। কেউ কেউ লুঙ্গিও পরেন। মেয়েরা বাড়িতে কাজ কর্ম করার জন্য সস্তা দামের,ছাপা সুতির শাড়ি পরতে পছন্দ করে। ঘরের বাইরে উৎসব-অনুষ্ঠানে উজ্জ্বল বর্ণের সিন্থেটিক, সিলিক (সিল্ক) শাড়ি পরতে ভালোবাসে। যুবকরা বাইরে বেরোয় তাই তাদের জামা, প্যান্ট পরতে হয়। ছোট ছোট মেয়েরা ফ্রক ও চুড়িদার পরে ঘুরে বেড়ায়।

প্রসাধন সামগ্রী :এরা গায়ে মাখে সুগন্ধি সাবান। মাথায় তেল ও শ্যাম্পু লাগিয়ে চুলের যত্ন নেয়। মেয়েরা মুখে মাখে স্নো-পাউডার। কপালে পরে নানা ডিজাইনের টিপ। ক্লীপ ও রঙিন ফিতে দিয়ে বিভিন্ন ভঙ্গিতে বাঁধে চুল।

অলংকার : বাজারে সোনার দাম চড়া। এদের আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভালো না হলেও বিয়েতে সোনা-রূপার গয়না দিতেই হয়। মাল জাতির বয়স্কারা তামা,পিতলের অলংকার বেশি পরে ।আর মেয়েরা পরে হাল্কা রূপা ও ইমিটিশানের গয়না। এরা হাত ভর্তি কাঁচের চুড়ি পরতে ভালোবাসে।

জীবিকা : মাল জাতির অনেকে নিজেদের পেশা চাষবাস বলে থাকে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় এদের চাষের জমি বিশেষ নেই। এখানকার মাল জাতির জাত ব্যাবসা বলতে গেলে তামা,পিতল,কাঁসা, অ্যালুমিনিয়ামের বিভিন্ন জিনিস বানিয়ে বিক্রি করে। এগুলোকে কুটির শিল্প বলে গণ্য করা যায় ।বাড়িতে বসে ছোট ছোট পিতলের খেলনা, কিছু আসবাবপত্র তৈরি করে। দ্রব্যগুলির মধ্যে প্রদীপ, সের, কাজললতা,চাটু ,বালা,ডিবা, পাই, পোয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ঘুঙুর, সানাই ,ঘাঁটি ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র এরা তৈরি করে। প্রত্যেকটি দ্রব্যের জন্য মাটির ছাঁচ ব্যবহার করে। মাটির ছাঁচ শুকিয়ে নিয়ে তার উপর ধুনা,ছাঁচিতেল,মোমবাতি প্রভৃতির সংমিশ্রণে এক প্রকার মোম তৈরি করে ছাঁচটির ওপর দিয়ে দেওয়া হয়। তার উপর ফারমা অনুসারে ধাতব খণ্ড এবং মাটি দিয়ে ঢেকে রোদে শুকিয়ে কাঠ কয়লা ও ঘুঁটে দিয়ে চুল্লির আগুন তৈরি করে পুড়িয়ে নিলে মোম গলে যায়। জিনিস তৈরি হয়।

এই জাতির অনেকেই সাপধরা, ঝাপান করা, সাপে কাটা রোগীকে ঝাড়ফুঁক দেওয়া ইত্যাদি কাজের মধ্যে দিয়ে রুজি রোজগারের পথ বেছে নিয়েছে। হাম, সটকা, মিলমিলা, বসন্ত, কলেরা ইত্যাদি রোগের চিকিৎসা করে, মাদুলি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। কেউ কেউ বাঁশের ডালায় লাল শালু দিয়ে অর্ধেক ঢাকা তেল সিঁদুর মাখানো শীতলা, ভগবতীর মূর্তি নিয়ে গান গেয়ে পয়সা রোজগার করে। বর্তমানে মাল জাতির লোকেদের কেউ কেউ লোকের বাড়িতে মুনিষ খাটে।

ধর্ম : মাল জাতির লোকেরা হিন্দু ধর্ম মেনে চলে। তবে কেউ কেউ নিজেদেরকে মুসলমান ধর্মের অনুগামী বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। অনেকে বৈষ্ণব,শাক্ত,শৈব ধর্মাবলম্বীও রয়েছে।

দেব-দেবী : মনসা, শিব, শীতলা, পীর, বড়াইসিনি, ধায় বুড়ি প্রভৃতি দেব-দেবী এদের হাতে পূজিত হন । এরা লোকউৎসবে অংশগ্রহণ করে।

লোকবিশ্বাস : এদের লোকবিশ্বাসের ধারাগুলি হল-

১. মালজাতির লোক সাপধরা, ঝাপান করা,সাপে কাটা, রুগিকে ঝাড়ফুঁক দিয়ে সারিয়ে তুলবার কাজে দক্ষ । এরা মন্ত্রতন্ত্র,তুকতাকে বিশ্বাসী ।

২. এছাড়াও সটকা, হাম, বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা করে থাকে । এমনকি গোরু-মহিষের রোগেরও এরা চিকিৎসা করে।

৩.এই জাতির লোকেরা নানা রকম শিকড়-বাকড় দিয়ে যে সব ঔষধ তৈরি করতো সেগুলি দিয়ে বিভিন্ন রোগ সারায় । বিভিন্ন গ্রাম থেকে এদের কাছে চিকিৎসার জন্য লোক আসতো । ঝাড়ফুঁক করে তাদেরকে মাদুলি দেয় ।

৪. পীরের দরগায় সিরণি চড়ালে অসুখ বিসুখ সারবে। কেউ কেউ মা কালীর থানে মানত করতো ।

৫. কার্তিক মাসে কালী পূজার রাতে শুকনো পাটকাঠি জ্বালানো হয় । এদের বিশ্বাস মৃত পূর্ব পুরুষদের আত্মা শান্তি লাভ করবে ।

লোকসংস্কার : প্রতিটি জাতির মতোই মাল জাতির মধ্যেও কিছু লোকসংস্কার রয়েছে। এদের সমাজের জন্ম-বিবাহ ও মৃত্যুকেন্দ্রিক লোকসংস্কারগুলি হল-

ক. জন্ম-সংস্কার :

১. মালদের বাড়িতে কোনো শিশু সন্তান জন্মগ্রহণ করলে অশৌচ পালন করে থাকে।

২. চারদিনে চাইরশ, নয় কিংবা এগারো দিনে নওয়াত অনুষ্ঠান হয় । প্রসূতিকে ধাইমা স্নান করায়। নাপিত এসে নখ, চুল, দাঁড়ি কেটে দেয়। ধোপা জামা-কাপড় কেচে দেয় ।

৩. সন্তান জন্মানোর চল্লিশদিন পার না হলে প্রসূতির হাতের ছোঁওয়া জল বাড়ির কেউ খায় না এমনকি তাকে রান্নাঘরে ঢুকতে দেয় না ।

খ. বিবাহ -সংস্কার :

১. আগে বাল্যকালে মেয়েদের বিবাহ হতো। বর্তমানে সে চিত্রের বদল কিছুটা ঘটেছে। প্রাপ্ত বয়স্ক হলে কন্যা বিবাহ হয়।

২. কনের ঘরের উঠানে বিয়ের অনুষ্ঠান হয়। মহুয়া এবং সিধা গাছের ডালপালায় ঘেরা পরিবেশে এদের বিবাহ সম্পন্ন হয়।

৩. কনেকে বরের চারপাশে সাতবার ঘোরানো হয়।

৪. মাল জাতির বিবাহ বেশিরভাগ সময় মৌলানারা দিয়ে থাকেন। দানা পোড়ানো, মিলাদ করা, কোরাণ পাঠ অতি অবশ্যই করতে হয়। কন্যাপক্ষ বিবাহে পণ দেয়।

গ. মৃত্যু-সংস্কার : মাল জাতির কেউ মারা গেলে তাঁরা চারদিন মুণ্ডাশৌচ পালন করে। মৃত ব্যক্তিকে কবর দেওয়া হয়। আবার হিন্দু মতে মৃতদেহ দাহ করা হয়। দাহ করার পর চিতাভস্ম পুকুর বা নদীতে নিক্ষেপ করা হয়।
মৃত্যুর এগারো দিনে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে তৃতীয় দিনে শ্রাদ্ধ হয়। কন্যা সন্তান মারা গেলে তার মৃতদেহ কবর দেওয়া হয়। তার মুখ থাকে নীচের দিকে। গরীব লোকের মৃতদেহের মাথা উত্তর দিকে রেখে কবর দেওয়া হয় নদীর চরে।

বিবাহরীতি: ছাদ্‌নাতলায় বর-কনেকে পাশাপাশি বসানো হয়।তারা পূর্বদিকে মুখ করে বসবে। ব্রাহ্মণ-এর আশীর্বাদ পুষ্ট এক পাত্র জল বর-কনের মাথায় ঢালা হয়। তারপর হয় পরস্পরের মালা বদল। বর-কনে-এই যুগলের কাপড়ে গিঁট বাঁধা হয়। একটি পৃথক ঘরে বর-কনেকে পাঠানো হয়। সেখান থেকে বেরিয়ে এলে সঙ্গী-সাথীরা তাদের স্বামী-স্ত্রী বলে অভিহিত করে।

সামাজিক রীতিনীতি :এদের সমাজের সামাজিক রীতিনীতি হল-

১. পুরুষেরা একাধিকবার বিবাহ করতে পারে। কিন্তু মেয়েরা পারে না । এদের তালাক দেওয়ার কোনো রীতির প্রচলন নেই। এইভাবে বিবাহকার্য সম্পন্ন হয় ।

২. ব্রাহ্মণ, মাহাত,কুমারদের বাড়িতে খেতে এদের কোনো বাধা-নিষেধ নেই ।

৩. চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সুরা মিশ্রিত জল উৎসর্গ করে থাকে ।

সমাজ অনুশাসন পদ্ধতি : এদের সমাজে অনুশাসন পদ্ধতি কঠোর নয় । সমাজের মাথা যা বলে বা নির্দেশ দেয় সেই অনুযায়ী এই জাতির সকলকে মেনে চলতে হয় । বর্তমানে এরা পঞ্চায়েত শাসন ব্যবস্থায় আস্থাশীল ।

টোটেম বা কুলচিহ্ন : মাল জাতিদের টোটেম বা কুলচিহ্ন হল- কাছিম (কচ্ছপ) ও শূকর ।

ট্যাবু বা নিষেধাজ্ঞা : মালজাতির মধ্যে মধ্যে কচ্ছপ ও শূকর দুটি গোত্র আছে । তাই এরা কচ্ছপ ও শূকর খেতে পারে না ।

লোকউৎসব : মাল জাতির লোকেরা অভাব-অনটনের মধ্যে দিন যাপন করলেও পাল-পার্বণ,উৎসব-অনুষ্ঠানে এখনও ভাটা পড়ে নি । এরা মনসা পূজা যেমন ধুমধামের সাথে করে তেমনি শিবপূজাও বেশ জাঁকজমকের সাথে করে থাকে। হাম,বসন্ত ইত্যাদি রোগের ওষুধ সারায় বলে এরা ভক্তিভরে মা শীতলার পূজা করেন । এছাড়া শিবের গাজন, টুসু, ভাদু ইত্যাদি লোকউৎসবেও এরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে ।

ভাষা : 'মানভুঁইয়া' ভাষায় তারা কথা বলে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারা : সমাজে মাল জাতি অস্পৃশ্য বলে বিবেচিত । শিক্ষাদীক্ষায় এরা অনেক পিছিয়ে ।এদের জাতব্যাবসা মূলধন ও বাজারের অভাবে ধুঁকছে । তাই এদের আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয় । জাত ব্যাবসা ছেড়ে এই জাতির লোকেদের কেউ কেউ ভগবতী মঙ্গল, শীতলা মঙ্গল, গো-বন্দনার গান গেয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায় । বর্তমানে মাল জাতির বেশ কিছু লোক অন্যদের বাড়িতে বাগাল মুনিষ খেটে রুজি রোজগারের পথ বেছে নিয়েছে। ডোকরা শিল্পকে এরা বাঁচিয়ে রেখেছে ।

১৩. লোহার

পুরুলিয়ার কামার সম্প্রদায়ভুক্ত যে জনগোষ্ঠী ধাতু শিল্পকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছে, সেটি হোল লোহার জাতি। কামার জাতির চেয়ে শ্রেণিগতভাবে কিছুটা নিম্ন। এরা বিচিত্রধর্মী এক মানব গোষ্ঠী। নানা জাতি ও উপজাতির সমন্বয়ে গঠিত এই সম্প্রদায়। পুরুলিয়ার গ্রামাঞ্চলে এবং পুরুলিয়া শহরের কোনো কোনো এলাকায় লোহার জাতির লোকেরা বসবাস করে। কামারদের মতো এরা প্রযুক্তিবিদ্যায় ততটা পারদর্শী নয়।

নৃতাত্ত্বিক পরিচয় : কামার সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠী হল লোহার। বলা হয় বাউরি ও বাগদি জাতির মধ্যে যারা লোহার কাজকে পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছিল তারা নিজেদেরকে লোহার বলে পরিচিত করালেন। বিশ্বামিত্র মুনিকে লোহারদের পূর্বপুরুষ বলে মনে করা হয়। বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির মিশ্রণে সৃষ্ট জাতি হল লোহার।

চেহারার বৈচিত্র্য : লোহার জাতির বেশিরভাগ লোকের মাথার আকৃতি গোল। নাক মাঝারি মাপের। গায়ের রঙ কালো, ঢেউ খেলানো তামাটে চুল বা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বাবরি চুল। দেহের গড়ন সুঠাম।

সামাজিক বিন্যাস :লোহার জাতির সামাজিক বিন্যাসে উপসম্প্রদায়, গোত্র, পদবি প্রভৃতি রয়েছে।

ক. উপসম্প্রদায় : পুরুলিয়ার লোহারদের মধ্যে তিনটি উপগোষ্ঠী বর্তমান। যথা-

ক) লোহার মাঝি

খ) দণ্ড মাঝি

গ) বাগদি-লোহার।

খ. গোত্র : লোহার জাতি শাণ্ডিল্য গোত্রটির সন্ধান পাওয়া যায়।

গ. পদবি : এই জাতির লোক লোহার পদবি ব্যবহার করে।

বাসস্থান : গ্রামে মাটির বাড়িতে লোহার জাতির বেশিরভাগ লোক বসবাস করে। ঘরের ছাউনির জন্য খড়,টালি,খাপরার সাথে সাথে টিন ও অ্যাডবেস্টাসও ব্যবহার করে। আর্থিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল যারা তারা পাকা বাড়িতে বসবাস করে।

খাদ্যাভ্যাস : লোহার জাতির লোকেরা ভাত, রুটি খায়। ভাতের সাথে রান্না করে খায় মাছ, মাংস, ডাল, শাক-সব্জি ইত্যাদি। এরা জলখাবার হিসাবে খায় মুড়ি, চিঁড়ে, বাসিভাত প্রভৃতি ।

ব্যবহারিক সামগ্রী : এরা স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম ও লোহার বালতি, কড়াই,খুন্তি প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করে থাকে। এখন এরা প্লাস্টিকের গামলা,কলসিও ব্যবহার করছে। এছাড়াও তারা কাঁসা ,পিতলের বাসনপত্র ব্যবহার করে থাকে। ধাতু নিষ্কাশন,ধাতু গলানো ও ধাতু পেটানোর যন্ত্রপাতি তাদের ঘরে দেখা যায়।

সাজ-পোশাক : লোহার জাতির বয়স্ক পুরুষেরা ধুতি, গেঞ্জি ,পাজামা,পাঞ্জাবি পরে। বয়স্ক মহিলারা সাদা ও ছাপা সুতির শাড়ি পরে বাড়ির কাজকর্ম করে। ছোট ছোট ছেলেরা হাফ প্যান্ট, গেঞ্জি, টি-শার্ট পরে ঘুরে বেড়ায়। যুবতীরা শালোয়ার, চুড়িদার কুর্তি পরে। যুবকরা প্যান্ট, শার্ট, জিনস পরে বাইরে বের হয়।

প্রসাধন সামগ্রী :লোহার জাতির মেয়েরা সাজতে একটু বেশি ভালোবাসে। হলুদ,চন্দন বেটে মুখে মাখে। ত্বক মসৃণ ও উজ্জল হয়। গায়ে নিমপাতা, হলুদ বেটে লাগায়। মেহেন্দি পাতা বেটে চুলে লাগিয়ে চুলের পরিচর্যা করে। তেল, সাবান, শ্যাম্পু ব্যবহার করে।

অলংকার : এই সম্প্রদায়ের মেয়েরা সোনা-রূপা গয়না কিনে পরে। এছাড়া বাড়ির বউ,মেয়েদের মধ্যে আধুনিক হাল্কা গয়নার প্রতি ঝোঁক দেখা যায় ।

জীবিকা : লোহারদের জীবিকা হল লোহা নিষ্কাশন, লোহা গলনো ও নানা তৈজসপত্র তৈরি করা। ঢালাই লোহা বা লোহার রড বাজার থেকে কিনে এনে তারা কাজ করে। লোহা গলিয়ে ও পিটিয়ে হাতা, খুন্তি, বঁটি, জাঁতি, কাঁচি, কোদাল, গাঁইতি ইত্যাদি জিনিস বানায়। কিছু পরিবার আছে যারা বংশ পরম্পরায় কাঁসার কাজ করেন। তারা ' কলস' তৈরিতে সিদ্ধহস্ত। বর্তমানে লোহার জাতির বেশিরভাগ লোক ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক কিংবা অদক্ষ দিনমজুর।

ধর্ম : এরা হিন্দু ধর্মের লোক। তবে নানান ধর্মের সমন্বয় ঘটেছে এই জাতির মধ্যে।

দেব-দেবী :শিল্পদেবতা বিশ্বকর্মা,সর্পদেবী মনসা, ভাদু ,দল্লি গোরাই,রাম ঠাকুর, বরন্দ ঠাকুর, ফুলই গোঁসাই,মোহনগিরি ইত্যাদি দেব-দেবীকে এরা পূজা করে। লোহাররা বোঙ্গারও পূজা করে। তবে নিজেদের পুরোহিত দিয়ে।

লোকবিশ্বাস : স্থানীয় পিশাচ সাধক ওঝা বা সখা দিয়ে আত্মার শান্তি করানো হয়। এরা ডাইনি, ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করে।

লোকসংস্কার :এদের সমাজে জন্ম,বিবাহ ও মৃত্যুকে ঘিরে অজস্র লোকসংস্কার রয়েছে। যথা-

ক. জন্ম সংস্কার :এদের সমাজে শিশুর জন্ম-সংক্রান্ত সংস্কারগুলি হল-

১.পাঁচ দিনে 'পাঁচসা', নয়দিনে 'লরাত' অনুষ্ঠানটি পালন করে। নাপিত এসে শিশু সন্তান ও প্রসূতির নখ,চুল কেটে দেয়। বাড়ির সবাই নখ, চুল, দাঁড়ি কেটে শুদ্ধ হয়। শিশুকে তেল-হলুদ মাখানো হয়।

২. একুশ দিনে ষষ্ঠী বটতলায় গিয়ে শিশুর মা পূজা করেন। 'একুশা' অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

৩.অন্নপ্রাশনে শিশু মামাবাড়ির ভাত খায়।

খ. বিবাহ-সংস্কার : এদের বিবাহ-সংস্কারগুলি হল-

১. বাল্যবিবাহ এককালে চালু থাকলেও আজ তা এদের সমাজে নেই। বাগদিদের মতোই একই রকম বিবাহ প্রথা রয়েছে।

২. প্রথমা স্ত্রীর সন্তান না থাকলে স্বামী পুনরায় বিবাহ করতে পারেন।

৩. লোহার জাতির মধ্যে আমগাছকে বিবাহ করার প্রথা রয়েছে।

৪. বিবাহের দিন জল সাইতে গিয়ে পুকুর ঘাটে জাঁতি দিয়ে জল কাটে তারপর সেই জল কলসিতে ভরে আনা হয়।

৫. ঘাট পূজা নেই।

গ. মৃত্যু-সংস্কার : এদের মৃত্যু-সংস্কারগুলি হল-

১. মৃতদেহ দাহ করা হয়।

২. আগে পনেরো দিনে অশৌচ পালন হতো। এখন দশ দিনেই অশৌচ পালন করে। অনেকে বারো দিনেও ঘাট শ্রাদ্ধ পালন করে।

৩.চারদিনে পুকুরঘাটে বেনা গাছ পোঁতে।

৪. শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে জমি ও গোদান করে থাকে।

বিবাহরীতি : বর ও বর যাত্রী কনের বাড়ির সামনে হাজির হলে কনের মা, মাসি, পিসি বরণ করে। মিষ্টি ও জল বরকে খেতে দেয়। বরকে ছাদ্না তলায় নিয়ে আসে। বরকে কেন্দ্র করে এয়ো নারীরা সাততী ঘোরে।
কনেকে ধরে ধরে ছাদ্না তলায় নিয়ে আসে। সে পান পাতায় মুখ ঢেকে রাখে। বর-কনেকে সামনা সামনি দাঁড় করিয়ে শুভদৃষ্টি সম্পন্ন হয়। ব্রাহ্মণ পুরোহিত মালাবদলের অনুষ্ঠান শুরু করেন। মালাবদল অনুষ্ঠানে বর ও কনে একে অপরকে প্রথমে আকন্দ ফুলের মালা এবং পরে রজনীগন্ধার মালা পরায়। তারপর ব্রাহ্মণ পুরোহিত বর-কনের হস্ত বন্ধন করে। বর টাকা দিয়ে কনের মাথায় সিঁদুর দান করেন। মন্ত্র পাঠ করে গাঁট বন্ধন করে পুরোহিত। আত্মীয়স্বজনেরা কুলোয় করে খৈ ছড়ানো অনুষ্ঠান করে। উলুধ্বনি দিয়ে বিবাহ কাজ সম্পন্ন হয়।

বিবাহ শেষ হলে বর-কনেকে একটি ঘরে বসানো হয়। ঐ ঘরে বাঁদানির অনুষ্ঠান বসে। এরপর কনে বিদায়ের পালা। কনে এক আঁজলা চাল হাতে দিয়ে ঘর পূরণ করে। মা আঁচল পেতে চাল ধরে ঘরে ঢুকে যায়। কনে আর পেছন ফিরে তাকায় না। বরের বাড়িতে কিছু লোকাচার পালনের মধ্য দিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

সামাজিক রীতি-নীতি : মৈথিল ব্রাহ্মণকে দিয়ে নানা দেব-দেবীর পূজা করা হয়। পঞ্চায়েতের মত অনুযায়ী বিবাহ-বিচ্ছেদ মেনে নেয়। বিধবা বিবাহ প্রচলন আছে। লোহার জাতির নিজস্ব পুরোহিত আছে।

সমাজ অনুশাসন পদ্ধতি : সমাজ অনুশাসনের দায়িত্বে আছেন পঞ্চায়েত প্রধান। পঞ্চায়েত প্রধানের নির্দেশ মেনেই এরা যাবতীয় কাজকর্ম করে থাকে।

লোক উৎসব : নবান্ন, মকর সংক্রান্তি,মনসা পূজা, ভাদু,করম ,শিবরাত্রি ইত্যাদি লোকউৎসবে এরা স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে আনন্দ-স্ফূর্তিতে মশগুল হয়ে ওঠে।

ভাষা : বেশিরভাগ মানুষ **'**মানভুঁইয়া' ভাষায় কথা বলে। তবে মার্জিত ভাষায় কথা বলতে এরা পারদর্শী।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারা : লোহার জাতির লোকেরা কামারদের চেয়ে শ্রেণিগতভাবে কিছুটা নিচে অবস্থান করে। এরা ধাতু শিল্পী হলেও কামারদের মতো প্রযুক্তিতে বিশেষ দক্ষ নয়। তবে এই জাতির কিছু লোক কাঁসার কাজ করে ভালো রোজগার করেন। এই জাতির অন্যান্য লোকেরা লোহার জিনিসপত্র হাটে-বাজারে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে থাকে। ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে এরা স্বচ্ছল নয়।

বর্তমানে সরকারি উদ্যোগে নানা রকমের মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। এইসব মেলাতে এরা নিজেদের তৈরি কোদাল,কাস্তে,গাঁইতি,শাবল ইত্যাদি জিনিসপত্র নিয়ে হাজির হয়। এতে তাদের শিল্পজাত দ্রব্যের প্রচার ও তার সাথে সাথে আর্থিক উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হয়ে উঠেছে।

১৪. শুঁড়ি

'শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল'- বহুল প্রচলিত এই প্রবাদে শুঁড়ি জাতির প্রসঙ্গ রয়েছে। প্রাচীন ' চর্যাপদ' গ্রন্থের ৩নং পদে শুঁড়ি জাতির উল্লেখ রয়েছে।

"এক সে শুণ্ডিনিণী দুই ঘরে সান্ধঅ।
চীঅণ বাকলঅ বারুণি বান্ধঅ।।" [৫]

পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে এই জাতির লোকেরা ছড়িয়ে আছে। ছড়রা, বাইকাটা, নূতনডি, রঘুনাথপুর প্রভৃতি স্থানে শুঁড়ি জাতির মানুষদের বসবাস বেশি লক্ষ্য করা যায়।

নৃতাত্ত্বিক পরিচয় : শুঁড়ি জাতি মধ্যম-সঙ্কর। পুরাণ মতে বৈশ্য পুরুষ ও তিয়র স্ত্রীলোক থেকে উৎপন্ন হয়েছে শুঁড়ি জাতি।

চেহারার বৈচিত্র্য : এদের উচ্চতা মাঝারি। গায়ের রং কালো। ঢেউ খেলানো চুল। নাক একটু চওড়া। দেহের গঠন দেখে মনে হয় কর্মঠ।

সামাজিক বিন্যাস : এদের সমাজে সামাজিক বিন্যাসে চোখে পড়ে উপসম্প্রদায়, গোত্র, পদবি, থাক, উপথাক প্রভৃতি।

ক. উপসম্প্রদায় : পুরুলিয়া জেলায় শুঁড়ি জাতির আটটি উপ সম্প্রদায় রয়েছে। তারা হল- অরিয়ার, বিয়াহুত, মঘাইয়া, লকরগঢ়া, হোলোঙ্গওয়ার, পরিপাল, শিখরিয়া, চতুরথান। প্রথম তিনটি উপগোষ্ঠীর মধ্যে আন্তর্বিবাহের ফলে এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠির সাথে মিশে যায় এবং একটি গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে।

মধ্য ও বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে চারটি উপগোষ্ঠী দেখা যায়- রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বঙ্গা এবং মগী। এদের সমাজে সদগোপ শুঁড়ি, মাহাত শুঁড়ির কথাও জানতে পারা যায়।

খ. গোত্র : ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, মার্কণ্ড ঋষি, মোজঋষি, আনন্দ ঋষি, গর্গ ঋষি ইত্যাদি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত শুঁড়ি জাতির লোকেরা।

গ. পদবি : শুঁড়ি জাতির পদবি সাধারণত সাহা ও মণ্ডল হয়। ধনী ব্যাবসায়ী হলে পদবি 'দাস'ও 'খান' করে নেয়, যাতে শুঁড়ি কথাটি চাপা পড়ে যায়। এছাড়াও এরা লায়েক, বিশ্বাস, চেল, বাগ, মিদ্যা, মাজী ইত্যাদি পদবি ব্যবহার করে থাকে।

বাসস্থান : শুঁড়ি জাতির বেশিরভাগ লোকেরা গ্রামে বাস করে। ঘরের দেওয়াল ইঁট ও মাটি দিয়ে তৈরি। বাঁশ, কঞ্চি ও খেজুরপাতা দিয়ে ঘেরা। ঘরের চালাগুলি খড়, টালি, খাপরার ছাউনি দিয়ে ঢাকা। কেউ কেউ টিন ও অ্যাডবেস্টাস দিয়ে ছাউনি দিয়েছে। এরা বাঁশ বা কাঠ দিয়ে চালার কাঠামো বানায়। কিছু কিছু ঘরের চালা খেজুর পাতা দিয়ে ছাওয়া। উঠোন থাকে নিকানো। মাটির দেওয়াল দিয়ে ঘেরা।

খাদ্যাভ্যাস : শুঁড়ি জাতির লোক দুবেলা ভাত খায়। ভাতের সাথে থাকে শাক-সব্জি, ডাল ,মাছ,মাংস ইত্যাদি । এরা মুড়ি খেতে খুব ভালোবাসে। তেল,নুন,লঙ্কা দিয়ে মেখে বেশ জমিয়ে মুড়ি খায়।

ব্যবহারিক সামগ্রী : শুঁড়িদের ঘরে গেলে বড় বড় হাঁড়ি দেখতে পাওয়া যায়। এরা কাঁসা ও পেতলের বাসনপত্র ব্যবহার করে। এদের গৃহে স্টিলের বাসনপত্র, অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি,গামলা,কড়াই চোখে পড়ে। বেতের ঝুড়ি,কুলা, কাঠের বাক্স প্রভৃতি সামগ্রী এদের নিত্যসঙ্গী।

সাজ-পোশাক : ঘরের কাজকর্ম করার জন্য শুঁড়ি জাতির মেয়েরা সুতির ছাপা শাড়ি পরতে ভালোবাসে। বয়স্কারা অনেক সময় লাল পেড়ে সাদা শাড়ি পরেন। তবে তাদের পোশাক অত্যন্ত মলিন। বিবাহিত মেয়েরা রঙিন শাড়ি পরতে পছন্দ করে। ছোট ছোট ছেলেরা প্যান্ট, গেঞ্জি পরে। তবে বেশিরভাগ সময় খালি গায়ে ঘুরে বেড়ায়। ছোট ছোট মেয়েরা ফ্রক,চুড়িদার, স্কার্ট পরে। বয়স্ক পুরুষেরা ধুতি, গেঞ্জি, ফতুয়া পরে কাজকর্মের তদারকি করেন। বাইরের কাজকর্ম করতে গেলে ছেলেরা প্যান্ট, শার্ট, গেঞ্জি, জিনস ইত্যাদি পোশাক পরে।

বিবাহিত মেয়েরা কোনো উৎসব-অনুষ্ঠানের জন্য বেছে নেয় সিন্থেটিক, সিল্কের শাড়ি। যুবতীদের পছন্দ হাল ফ্যাশানের জামা।

প্রসাধন সামগ্রী : শুঁড়ি জাতির লোকেরা গায়ে তেল ও সাবান মাখে। মাথায় তেল ও শ্যাম্পু ব্যবহার করে থাকে। মেয়েরা আমলা, শিকাকাই, রিঠা ফল ব্যবহার করে চুলের যত্ন নেয়। হাতে মেহেন্দি পরে।

মুখে মাখে স্নো-পাউডার। ক্লীপ ও রঙিন ফিতেয় নানা ধরনের চুল বাঁধে। কপালে নানা বর্ণের নানা ধরনের টিপ পরে। চোখে দেয় কাজল। ঠোঁটে লাগায় লিপস্টিক। এভাবেই নিজেদের সাজিয়ে তোলে।

অলংকার : নারী-পুরুষ উভয়েই সোনা-রূপার গয়না পরে। কোনো অনুষ্ঠানে তারা রূপার, ইমিটিশানের গয়না ব্যবহার করে। এখন পাথর বসানো নানা ধরনের চুড়ি, গলার হার, কানের দুল বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। সেগুলো দেখতে সুন্দর অথচ দামও কম। সেগুলোর দিকেই মেয়েদের ঝোঁক বাড়ছে।

জীবিকা : চোলাই মদ তৈরি ও বিক্রি করাই শুঁড়ি জাতির লোকেদের আদি জীবিকা। তবে এরা জীবিকার ক্ষেত্র পরিবর্তন করেছেন।

শুঁড়ি জাতির লোকেদের মধ্যে অনেকের পদবি 'সাহা'। এই 'সাহা' পদবিধারী ব্যক্তিরা নানা ধরনের ব্যাবসা করেন। যেমন- বস্ত্র ব্যাবসা, লবণ ব্যাবসা এবং কাঠের ব্যাবসায় এরা নিযুক্ত। এইসব ব্যাবসায়ে নিযুক্ত লোকদের বলা হয় 'আমদাওয়ালা'। এরা পাইকারি ভাবে জিনিসপত্র আমদানি করে এবং খুচরো ব্যাবসায়িদের বিক্রি করে। একারণে এদের 'মহাজন', 'গোলদার', এবং 'আড়ৎদার' বা 'দালাল' নামে অভিহিত করা হয়।

আবগারি দপ্তরে বেশিরভাগ কর্মচারী হল শুঁড়ি সম্প্রদায়ের লোক। শুধু তাই নয় শুঁড়ি জাতির লোকেরাই বেশিরভাগ গাঁজার দোকানের মালিক। এদের সমাজে শিক্ষার হার অন্যান্য তফসিলি জাতির থেকে বেশি। এদের সমাজের শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করে জীবিকা নির্বাহ করে।

ধর্ম : শুঁড়ি জাতির লোকেরা প্রধানত হিন্দু ধর্মের লোক হলেও এরা বৈষ্ণব ধর্মের অনুরাগী। শ্রীচৈতন্যের নামগান শ্রবণ করে থাকে।

দেব-দেবী : শুঁড়ি জাতির কুলদেবী হলেন লক্ষ্মী। এরা বৃহস্পতিবার দেবীর আরাধনা করে। কার্তিক মাসে কার্তিক ঠাকুরের পূজা দেয়। ধর্ম,শিব,চণ্ডী,মনসা, মোহনগিরি ইত্যাদি দেব-দেবীর আরাধানা করে। যুবতীরা টুসু,ভাদু পূজা করে। নৌকা যাত্রার প্রাক্কালে এরা গঙ্গাদেবীর পূজা দেয়।

লোকবিশ্বাস : এদের সমাজে অজস্র লোকবিশ্বাস রয়েছে। যেমন-

১. কার্তিক পূজা করলে সন্তানহীনা রমণী সন্তান লাভ করে। পূজার পরে মূর্তিটি বিসর্জন না দিয়ে একবছর অন্দরমহলে রাখা হয়,তাদের বিশ্বাস বন্ধ্যা রমণী গর্ভবতী হন।

২. কোজাগরী জাগরণে লক্ষ্মীলাভ হয় ,ঘুমিয়ে পড়লে লক্ষ্মী বিরূপ হন।

৩. এরা ডাইনি,ভূত-প্রেত যেমন বিশ্বাস করে তেমনি ওঝা ,সখ্যান, গুণিন ইত্যাদি লোকেদের ঝাড়ফুঁকের ওপর অগাধ বিশ্বাস রয়েছে।

লোকসংস্কার : শুঁড়ি সমাজে অজস্র লোকসংস্কার রয়েছে। যেমন-

ক. জন্ম-সংস্কার :শুঁড়ি সমাজের মধ্যে শিশুর জন্মকে কেন্দ্র করে অজস্র লোকসংস্কার চোখে পড়ে । যেমন-

১. শুঁড়িদের গৃহে শিশু সন্তান জন্মালে ধাইমা এসে নাড়ি কেটে দেয়।

২.এখন হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে এলে শিশুকে সেঁক দেয়। ধাইমা ঘরে শিশু মঙ্গলের জন্য আতুড় ষষ্ঠী পাতেন ।

৩.চার দিনে প্রসূতিকে 'ঝালভাত' দেয়।

৪. আট দিনে পোড়া মাছ,মিষ্টি দিয়ে ষষ্ঠী বটতলায় পূজা সম্পন্ন করে। নয় দিনে 'লরাত' অনুষ্ঠান হয়। নাপিত এসে নখ কাটে। পরিবারের জন্ম অশৌচ দূর হয়।

৫. একুশ দিনে 'একুশা' পালন করে। এই দিন কামার ঘর থেকে লোহার বালা এনে শিশুকে নতুন জামাকাপড় পরানো হয় এবং বালাটি তাকে হাতে পরিয়ে দেওয়া হয়।

৬. এরপর 'মুখেভাত' অনুষ্ঠান হয়। ছেলের ক্ষেত্রে ছ' মাস আর মেয়ের ক্ষেত্রে সাত মাসে 'মুখেভাত' অনুষ্ঠান হয় ।

খ. বিবাহ-সংস্কার : এদের বিবাহ-সংস্কারগুলি হল-

১. স্বগোত্রে বিবাহ হয়। ঘটকের মারফৎ বিবাহ স্থির হয়।

২. পাত্রপক্ষ কনেপক্ষর গৃহে উপস্থিত হয় এবং পাকা কথা হলে কনের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দেওয়া হয়। প্রতিদানে কনের পিতা কিছু টাকা-পয়সা,কাপড় পাত্রের জন্য পাঠায়। এইরূপ দানকে 'তিলক' বলা হয়। প্রথা অনুযায়ী তিলকের পরিমাণ ১০১ টাকার বেশি এবং এক জোড়া ধুতির থেকে বেশি হয়। তিলক দেওয়ার সময় ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীকে ডেকে বিবাহের দিন স্থির হয়।

৩. কেউ কেউ তুলসী তলায় আলপনা দেয়। সেখানে পাত্রপক্ষকে বসানো হয়। কনে নিজের বাড়ির বস্ত্র পরে আসে। পাত্রপক্ষ পাত্রীকে ধান, দূর্বা, সোনার গয়না, প্রাসাধনী সামগ্রী দিয়ে আশীর্বাদ করে।

৪. আশীর্বাদির পরে লগন বাঁধা অনুষ্ঠান হয়। জামাইদাদা বা মেসো বা পিসেমশাই একটি নতুন গামছায় এলাচ, লবঙ্গ, শন দিয়ে বাঁধা হলুদ, আতপ চাল, গোটা সুপারি গামছায় বেঁধে কনে বাড়িতে নিয়ে যায়। আবার কনের বাড়ি থেকে ছেলের বাড়িতে লগন বেঁধে নিয়ে যায়।

৫. ছেলের বাড়ি থেকে লগন আসার পর কনেকে আইবুড়ো ভাত খাওয়ানো হয় । ঐদিন তেল-হলুদ মাখে, নতুন বস্ত্র ও সোনার গয়না পরে বর ও কনে নিজের নিজের বাড়িতে ক্ষীর ভাত বা পায়েস খায় । ভাত, তরকারি, মাছ দিয়ে আইবুড়ো ভাত খাওয়ানো হয়।

গ. মৃত্যু-সংস্কার : এদের সমাজের মৃত্যু-সংস্কারগুলি হল-

১.শুঁড়িরা মৃতদেহ দাহ করে । আগে মৃত্যুর পরে তিরিশ দিনে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান হতো। বর্তমানে বারো দিনে ঘাট শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান পালন করে।

২. পলাশ কাঠিতে তুলো বেঁধে মুখাগ্নি করে। উত্তর দিকে মৃতদেহের মাথা রেখে দাহ কার্য সম্পন্ন করে ।

৩. তুলসী তলায় অস্থি রাখা হয়। তারপর সেটি নদীতে বা গঙ্গায় বিসর্জন করা হয়।

৪. দুটি,তিনটি হবিষ্যি করা হয়।

৫. আটা গোল গোল করে কলা,তিল দিয়ে মেখে পিণ্ড দান করা হয়।

৬.দশ কিংবা বারো দিনে শ্রাদ্ধ করে। শ্রাদ্ধের দিনে আত্মীয়স্বজনদের খাওয়ানো হয়। দুদিন কেউ শ্রাদ্ধ করলে একদিন মিষ্টি, লুচি, বোঁদে পরের দিন মাছ, মাংস, ভাত খাওয়ানো হয়।

বিবাহরীতি : বিয়ের দিন সকালবেলায় তুলসী তলায় সিধা ডাল,মহুল ডাল পুঁতা হয়। সিরিবারি সাজায়। ছাদ্‌নাতলা তৈরি করে। পুরোহিত গুঁড়ি দিয়ে পাঁচিলে আলপনা দেয়। তার ওপর গোবর,সিঁদুর ও কড়ি দিয়ে পূজা করা হয়। নমস্কার করে 'ঘি ঢালি' ও 'বসুধারা' অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

সন্ধ্যাবেলায় মেয়েরা জল সাইতে যায়। জামাইবাবু লোহার জাতি দিয়ে জল কাটে। পুকুর ঘাটে ইঁদুর মাটি, তুলসী পাতা, ডিম, আতপ চাল, প্রদীপ, ধূপ কাঠি জ্বেলে কনের বা বরের মা ঘাট পূজা করে। ডিমটা জলে ফেললে ডোম সেটি কুড়িয়ে নেয়।

সন্ধ্যাবেলায় বরযাত্রী এলে প্রথমে জলের হাঁড়ি দেখানো হয়। আমপাতা দিয়ে জলের ছিটা দেয়। মিষ্টিমুখ করে বরকে গাড়ি থেকে নামানো হয়। এরপর বরকে ঘরে নিয়ে যায়। একটি ঘরে বসতে দেয়। বর আসার পর কনেকে স্নান করানো হয়।

বরকে নিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হয়। পুরোহিতের মন্ত্র উচ্চারণ করে কনের পিতা মাতুলদের হাতে পান, সুপারি, ফল তুলে দেয়। এরপর কনের পিতা বরের ডান হাতের কড়ে আঙ্গুল ধরে আর ডান হাঁটু ধরে মন্ত্র উচ্চারণ করে। এরপর আম বোটায় সলতে জ্বেলে বরের গালে ছোঁওয়ানো হয়। বরকে মাঝে রেখে তিন বা সাত পাক সাততী ঘোরে। এরপর মখমলের কাপড় দিয়ে বরের মাথা ঢেকে দেওয়া হয়। তার মুখ কেউ যেন দেখতে না পায়। কনেকে পিঁড়িতে বসিয়ে বা হাঁটিয়ে ছামড়া (ছাদ্‌না)তলায় নিয়ে আসে। পান পাতায় মুখ ঢেকে তিন বা সাত পাক বরকে কেন্দ্র করে ঘোরায়। কাপড়ের তলায় বর-কনেকে দুজনকেই দাঁড় করায়।বিয়ের মূল অনুষ্ঠান মালাবদল শুরু হয়। বর ও কনে একে অপরকে আকন্দ ফুলের মালা পরায়। এভাবে তিনবার মালাবদল করতে হয়।

পরবর্তী অনুষ্ঠান 'আগুরি পোওয়া'। অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে কনে এবং গ্রামের মেয়েরা ঘোরে। বর এবং কনের ডান হাত হলুদ কাপড়ে বেঁধে 'হস্ত বন্ধন'অনুষ্ঠান শুরু হয়। পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করে। অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে পূজা করার পর বর পোয়া বা টাকায় সিঁদুর লাগিয়ে মন্ত্র পাঠ করে কনের সিঁথিতে পরিয়ে দেয়। কনের মাথা লজ্জাবস্ত্র দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এভাবে তিনবার করতে হয়।

এরপর কনের হাতে একটি ছোট কুলো ধরিয়ে দেয়। খই দিয়ে ভরা থাকে সেই কুলো। কনেকে বর পেছন দিক থেকে ধরে থাকে। খই ছড়াতে ছড়াতে বর-কনে দুজনেই ঘুরতে থাকে। তিন বা সাত বার এভাবে ঘুরতে হয়।

পরবর্তী পর্যায়ে একটি কাঁসার থালা মেঝেতে রেখে দেয়। তাতে থাকে পান, সুপারি। কনে মেঝেতে রাখা সেই থালাটি বাম পা দিয়ে ঠেলতে থাকে। কনের কোলে একটি ছোটো ছেলেকে বসিয়ে দেয়। প্রথমে বর অগ্নিকুণ্ডে ঘৃতাহুতি দেয় তারপর বর-বধূ দুজনে দাঁড়িয়ে অগ্নিকুণ্ডে ঘি দেয়। ছাদ্‌না তলায় বিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়। বর-বধূ দুজনকে ঘরে বসায়। মিষ্টি, জল খাওয়ায়।

এরপর হয় বাঁদানি অনুষ্ঠান। অনেকে শ্বশুরবাড়িতেই ছয় দিনের দিন বধূর বাঁদানি বসায়। আর সাতদিনে ছেলেটির বাঁদানি বসে। তবে ইদানিং পরের দিনই বাঁদানি বসানো হয়। প্রদীপ জ্বেলে ধান,দূর্বা,সিঁদুর ও টাকা দিয়ে বর-বধূকে আশীর্বাদ করে।

তুলসী তলায় ছামানি ভাঁড় নাড়ানো অনুষ্ঠান হয়। কনে বিদায়ের আগে দুটি থালায় বর এবং কনেকে পান্তা ভাত খাওয়ানো হয়। কনে বিদায়ের সময় এক আঁজলা চাল পেছেন দিকে ছুঁড়লে মা আঁচল পেতে সেই চাল গ্রহণ করে।শ্বশুর বাড়িতে নববধূকে বরণ করা হয়। হাতে লোহার নোয়া পরায়। নববধূকে শাশুড়ি ধান মাপতে দেয়। কিছুজন সেই ধান লুকিয়ে দেয়। ধান কোথায় জিজ্ঞেস করে। এইভাবে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

সামাজিক রীতি-নীতি : এদের সমাজের বেশ কিছু সংস্কার চোখে পড়ে। যথা -

১. এদের সমাজে আগে বাল্যবিবাহ ছিল। কিন্তু এখন বাল্যবিবাহ নেই।

২.কোনো মেয়ে বিধবা হলে তাকেও পুনরায় বিবাহ করতে বলে। কেউ বিবাহ-বিচ্ছেদ চাইলে শালপাতা ছিঁড়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাতে সায় দেয়। শালপাতা ছিঁড়ে দু টুকরো করা প্রতীক রূপে বিবেচিত হয়।

৩. কনের চেয়ে বর লম্বা কিনা তা জানার জন্য এদের উচ্চতা মেপে দেখা হয়। মাপার সময় 'গিরা' র উল্লেখ করতে হয়। কনের উচ্চতা ১২ গিরা হলে পাত্রের উচ্চতা হবে ১৪ ও ১৬ গিরা।

৪. কার্তিক মাসে শুক্লপক্ষে পূর্ব পুরুষদের উদ্দেশ্যে জল অর্পণ করা হয়।

৫. মৃতের ডান পায়ের হাড় বা হাতের অস্থি পুকুর বা নদীতে বিসর্জন দেওয়া রীতি আছে।

সমাজ অনুশাসন পদ্ধতি : সমাজ অনুশাসন পদ্ধতি পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন 'মোড়ল'। তবে এখন পঞ্চায়েত শাসন ব্যবস্থা থাকায় সুবিচারের আশায় এরা পঞ্চায়েতে ছুটে যায়। সেখানে বসে সমস্যার মীমাংসা করে।

ট্যাবু বা নিষেধাজ্ঞা : শুঁড়ি জাতির বেশিরভাগ লোক বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী বলে এরা দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে পশু-পাখি বলি দেয় না।

লোকউৎসব : এদের সমাজের নর-নারীরা মনসা পূজা,ধর্ম পূজা করে থাকে। তারা টুসু,ভাদু উৎসবেও অংশগ্রহণ করে থাকে। গ্রাম দেবতার পূজায় মানত রাখে। পশু-পাখি বলিদান দেয়।

ভাষা : পুরুলিয়ার আদিম জনগোষ্ঠীর মানুষ 'মানভুঁইয়া' ভাষা ব্যবহার করে। এরা মার্জিত ভাষায় কথা বলে থাকে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারা : শুঁড়িরা অস্পৃশ্য জাতি। ব্রাহ্মণরা এদের নাম মুখে উচ্চারণ করতো না। চোলাই মদ তৈরি ও বিক্রি করার জন্য শুঁড়ি জাতির লোকেদের উচ্চ সম্প্রদায়ের লোকেরা অবজ্ঞা, অবহেলা করতো। তবে এমন দৃশ্য আর চোখে পড়ে না। অর্থনৈতিক দিক থেকে এরা দুর্বল। দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিন যাপন করে থাকে। আর্থিক সঙ্গতি এদের না থাকায় ছেলে-মেয়েরা স্কুলে না গিয়ে মাঠে-ঘাটে বেরিয়ে পড়ে কোনো না কোনো কাজের সন্ধানে। শিক্ষার আলো যারা পেয়েছে তারা নানা পেশায় নিযুক্ত হয়ে জীবিকা নির্বাহ করছে। তাদের মধ্যে আর্থিক স্বচ্ছলতা এসেছে।এদের সমাজের সিংহভাগ লোক জীবিকার ক্ষেত্র পরিবর্তন করেছে।

১৫. তুরি

পুরুলিয়া জেলার তফসিলি জাতিদের মধ্যে যেমন সংখ্যা গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মানুষদের দেখা পাওয়া যায় তেমনি এর পাশাপাশি বসবাস করেন কম জনসংখ্যার তফসিলি সম্প্রদায়। তুরি জাতিদের জনসংখ্যা প্রায় ৫৪৪। সুতরাং সংখ্যার দিক থেকে এরা অনেক কম। এরা ঝাড়খণ্ডের আদি বাসিন্দা।

নিতুড়িয়া থানার অন্তর্ভুক্ত শালতোড়া, পারবেলিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলে তুরি জাতির মানুষেরা বসতি গড়ে তুলেছে।

নৃতাত্ত্বিক পরিচয় : নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে এই জাতির লোকেরা অনার্য। এরা প্রোটো-অস্ট্রালয়েড গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তুরি জাতির,ভাষা,ধর্ম মনে করিয়ে দেয় যে এরা তফসিলি উপজাতি মুণ্ডাদের থেকে উৎপত্তি হয়েছে।

চেহারার বৈচিত্র্য : শারীরিক গঠনের দিক দিয়ে এরা বেঁটে ,এদের মাথা লম্বা থেকে মাঝারি। নাক চওড়া ও চ্যাপ্টা। এদের চুল তামাটে কিন্তু ঢেউ খেলানো। এদের গায়ের রঙ কালো। মুণ্ডাদের থেকে উৎপত্তি হওয়ার দরুণ তুরিদের দৈহিক গঠন মুণ্ডাদের মতো। অনার্য গোষ্ঠীর মতো দেহের রঙ কালো। নাক একটু মোটা প্রকৃতির।

সামাজিক বিন্যাস : এদের সামাজিক বিন্যাসে রয়েছে উপসম্প্রদায়,গোত্র,পদবি। যথা-

ক. উপসম্প্রদায় : তুরি জাতির লোকেদের মধ্যে চারটি উপসম্প্রদায় রয়েছে। সেগুলি হল- তুরি বা কিষান তুরি, ওর, ডোম, ডোমরা। ঝুড়ি তৈরির পদ্ধতি এবং বাঁশের জিনিস বানানোর পদ্ধতি অনুসারে তাদের বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। ভুইনহারি জমির অধিকারী। এরা টোকরি বা টোকিয়া বানায়। এটা বড় ঝুড়ি মুখটা বেশ খোলা। এটা বাঁশ ও তালপাতা দিয়ে তৈরি করে।

1. তুরি বা কিষান তুরি : এরা প্রধানত কৃষিজীবী। এরা বাঁশপাতা ও তালপাতা দিয়ে তৈরি করে 'টোকরি' বা 'টোকিয়া'। এটা বড় ঝুড়ি। এর মুখটা বেশ খোলা।
2. ওরঃ ওড়িয়া ঝুড়ি থেকে 'ওর' নামটি এসেছে। টুকরো বাঁশ দিয়ে বা তালপাতা দিয়ে এরা তৈরি করে 'ছোটকা ডালি' বা 'ডালা'। এগুলো চ্যাপ্টা ঝুড়ি। এর ধারগুলি উঁচু। অল্প অল্প শস্যকণার জন্য এর ব্যবহার। এরা ছাতাও তৈরি করে।
3. ডোম : ডোম 'হরকা' বানায়,তরাজু তৈরি করে।
4. ডোমরা : ডোমরা পেটি এবং পাখা বানায়।

খ. গোত্র : তুরি জাতির দুটি গোত্র সম্পর্কে জানা যায়- ১.কাশ্যপ গোত্র,
২. নাগ গোত্র।

গ.পদবি : তুরি জাতির লোকেরা তুরি এবং মির্ধা –এই দুটি পদবি ব্যবহার করেন।

বাসস্থান : গ্রামের মধ্যে তুরি জাতির লোকেরা মাটির বাড়িতে বসবাস করে। ঘরের চালাগুলি নিচু ধরনের হয়। এদের বাড়ির চালাগুলি টালি,খড় ও খাপরা দিয়ে ছাওয়া থাকে। কেউ কেউ অ্যাডবেস্টাস, ও টিন ব্যবহার করে। কেউ কেউ ইঁটের পাকাবাড়িতেও বাস করে।

খাদ্যাভ্যাস : তুরি জাতির লোকেরা ভাত ও রুটি খায়। নানা ধরনের শাক-সব্জি,মাছ,মাংস,ডিম ইত্যাদি খেতে পছন্দ করে। কখনও কখনও চিঁড়া,মুড়ি,গুড় ,ছাতু ইত্যাদিও খায়।

ব্যবহারিক সামগ্রী : কেউ কেউ আজও রান্না করার জন্য মাটির হাঁড়ি ও কড়াই পছন্দ করে। আবার কেউ কেউ নিজেদের সুবিধার জন্য অ্যালুমিনিয়াম ও স্টিলের বাসনপত্র বেছে নেয় । তবে এরা মাটির কলসি,হাঁড়ি ,কুঁজোকেই বেছে নেয় পানীয় জল রাখার পাত্র হিসাবে ।মাটির পাত্রে জল ঠাণ্ডা থাকে। অনেকের বাড়িতে চীনামাটির কাপ,প্লেটও দেখতে পাওয়া যায়। বাঁশ ও বেতের ঝুড়ি, কুলো, টুপা, ডালা, ঝাঁটা ইত্যাদি জিনিসও এরা ব্যবহার করে।

সাজ-পোশাক : বাড়িতে কাজ কর্ম করার জন্য নারীরা চলতি ছাপা সুতির আটপৌরে শাড়ি পরতে ভালোবাসেন। সাপটা দিয়ে শাড়ি পরে কোমরে জড়িয়ে নেয় ।যুবতীরা চুড়িদার,ফ্রক, শালোয়ার প্রভৃতি পোশাক পরে। বয়স্ক পুরুষেরা ধুতি,গেঞ্জি ,ফতুয়া গায়ে দেয়। যুবকরা প্যান্ট,শার্ট,গেঞ্জি ,জিনসের পোশাক পরতে পছন্দ করে। শীতকালে উলের সোয়েটার, চাদর গায়ে দেয়।

প্রসাধন সামগ্রী : আগে এদের সমাজের মেয়েরা চন্দন,তুলসিপাতা বেটে মুখে লাগাতো। অর্জুন,নিম ছাল বেটে মলম তৈরি করে গায়ে মাখতো। এর ফলে খোস-পাঁচড়া দূর হয়। তুরি জাতির ছেলে-মেয়েরা বাজারের চলতি তেল, শ্যাম্পু দিয়ে চুলের যত্ন নেয়। গায়ে-মাখা সাবান ব্যবহার করে। মেয়েরা মুখে মাখে স্নো-পাউডার। কপালে পরে টিপ। ঠোঁটে লাগায় লিপস্টিক। হাতে মেহেন্দি লাগায়।

অলংকার : আর্থিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল নারীরা সোনা-রুপার গয়না পরেন। এদের সমাজে ইমিটিশানের গয়নার চল বেড়েছে।

জীবিকা : ঝুড়ি-চাঙ্গাড়ি তৈরি করার জাতি তুরি। এই জাতির লোকেরা বাঁশ ও বেতের কারিগর। বাঁশ দিয়ে এরা নানা ধরনের জিনিস বানায়। যেমন- ঝুড়ি,টুপা,কলমদানি ইত্যাদি। অনেকেই এরা কৃষিজীবী। কিষাণ তুরি কৃষিজমির অধিকারী। কৃষিকাজ এদের অন্যতম জীবিকা। এদের কেউ কেউ ঢোল বাদক। এই জাতির কিছু কিছু মেয়েরা ধাইমার কাজ করে থাকেন।

ধর্ম : তুরি জাতি হিন্দু ধর্মাবলম্বী। এরা হিন্দু দেব-দেবীর পূজা দেয়।

দেব-দেবী : তুরিদের কাছে দেবতার আসনে রয়েছেন শ্রী নারায়ণী। বহিরাগতদের কাছে তিনি শিব নারায়ণী। এই জাতির লোকেরা দেবী মনসার পূজার্চনা করেন। এছাড়াও তারা শীতলা,চণ্ডী,ধর্ম ঠাকুর ইত্যাদি সব দেব-দেবীর আরাধনা করেন। এরা গ্রাম দেব-দেবীরও মানত রেখে পূজা দেয়।

লোকবিশ্বাস : তুরি সমাজের লোকেরা ভূত-প্রেত, ঝাড়-ফুঁক, তন্ত্র–মন্ত্র বিশ্বাস করে। এদের সমাজে ওঝা, গুণিন, সখ্যানরা ঝাড়ফুঁক, তুক-তাক কাজ করে।

লোকসংস্কার : তুরি সমাজে জন্ম-বিবাহ-মৃত্যুকেন্দ্রিক লোকসংস্কারগুলি হল-

ক. জন্ম-সংস্কার : শিশু জন্মগ্রহণ করার পর এরা নানা সংস্কার মেনে চলে। সেগুলি হল-

১.শিশু জন্মগ্রহণ করার পর প্রসূতিকে দুদিন উপবাসে রাখা হয়।

২. তিনদিন পর প্রসূতিকে ভাত খেতে দেওয়া হয়।

৩. কেউ কেউ পাঁচদিন পর 'পাঁচসা' অনুষ্ঠানে শিশুকে তেল-হলুদ মাখিয়ে শুদ্ধ করে । নাপিত বাড়ির সবাইকে ক্ষৌরকর্ম করায়।

৪.নয়দিন পর 'লারাত' এবং একুশ দিনে 'একুশা' পালন করে।

৫. তুরি সমাজের নারীরা নিজেরাই ধাইমার কাজটি সম্পন্ন করে থাকে ।

বিবাহ-সংস্কার : তুরি জাতির বিবাহ- সংস্কারগুলি হল-

১. সময়ের সাথে সাথে সব জাতির মতো তুরি জাতির বিবাহ সংস্কারে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। এখন যে যার সুবিধে মতো লোকাচারগুলি পালন করে। আগে তুরিদের আর্শীর্বাদ অনুষ্ঠানটি কয়েকদিন ধরে পালন করা হোত। তবে এখন অনেকে বিয়ের দিনই আশীর্বাদ অনুষ্ঠানটি করে।

২. পাত্রপক্ষের লোক কনেকে ধান-দূর্বা,ফল,মিষ্টি,শাড়ি,গয়না দিয়ে আশীর্বাদ করে। আর পাত্রকেও কনের বাড়ির লোক ফল,মিষ্টি,সোনার চেন,আংটি ,ঘড়ি ইত্যাদি জিনিস দিয়ে আশীর্বাদ করে।

৩.বৌদি হলুদ অনুষ্ঠানের পর কনের গায়ে-হলুদ দেওয়া হয়। অনেকে দুদিন ধরে গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান পালন করে।

৪.আমপাতা, চাল, পয়সা, হলুদ দিয়ে লগন বাঁধা অনুষ্ঠান হয় ।

৫. তিন থেকে পাঁচ রকমের সব্জি,ডাল,ভাত সহযোগে আইবুড়ো ভাত খাওয়ায় ।

গ. মৃত্যু-সংস্কার : তুরি জাতিদের মধ্যে মৃত্যুকে ঘিরে বেশ কিছু সংস্কার রয়েছে । যথা-

১.তুরি সমাজে কোনো মানুষ মারা গেলে দশ দিনে ঘাট হয়।

২.মৃতদেহ পোড়ানোর পর অস্থি গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয়।

৩. পুকুর ঘাটে বেনা গাছ পুঁতে দেয় ।

৪. হবিষ্যান্ন রান্না করে মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে ।

৫.এগারো দিনে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পালন করে।

৬. বারো দিনে বাসি শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করে। ঐদিন আত্মীয়স্বজনদের ডেকে খাওয়ানোর রীতি আছে।

বিবাহরীতি: বিয়ের দিন আমগাছ ও মহুয়া গাছকে পূজা করে। বাড়ির বউদি,কাকিমা,পিসিমা ইত্যাদি নারীরা পুকুর ঘাটে জল সাইতে যায়। সেখানে গিয়ে ডিম,সিঁদুর,কাজল ইত্যাদি নানা দ্রব্য দিয়ে ঘাট পূজা করে।বর বিয়ে করতে আসার পূর্ব মুহূর্তে মায়ের বুকের দুধ খেয়ে কনে বাড়ির উদ্যেশ্যে রওনা দেয়। বর পক্ষ কনে বাড়িতে উপস্থিত হলে কনের বাড়ির লোক জল ঘটি থেকে আমপাতায় করে জল ছেটায়। কনের মা বরণ করে ।

বর জল দিয়ে বাড়ির বড়দের পা ধোওয়ায়। এরপর বরযাত্রীদের একটি ঘরে বসতে দেয়। কনের মা-কাকিমা, জেঠিমা প্রভৃতি নারীরা কনের আল্ল খায়। আর কনেকে বিবাহের পূর্বে মায়ের বুকের দুধ খায়। এটাই তাদের শেষ দুধ খাওয়া। ছাদ্না তলায় বরকে নিয়ে ছোট ছোট লৌকিক আচার পালন করা হয়।

আগে খুব ছোটো বয়সে ছেলে-মেয়ের বিবাহ হতো। তাই বর-কনেকে কোলে করে ছাদ্নাতলায় নিয়ে আসা হতো । তবে বর্তমানে কনেকে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে আসে । বরের চারপাশে সাতপাক ঘোরে। শুভদৃষ্টি সম্পন্ন হয় । এরপর মালাবদল হয়। বর ও কনে একে অপরের আকন্দ ফুলের মালা ও গুয়া পৈতার মালা বদল করে। তারপর বর-

কনের ‘হস্ত বন্ধন’ অনুষ্ঠান হয়। তুরিদের বিবাহে যজ্ঞ অনুষ্ঠান হয় না। মাড়ুয়ার কাছে একটি থালায় বিরি কলাই, প্রদীপ রাখা থাকে। সেখানে জলের কলস ও দুটি প্রদীপ রাখা থাকে। সেখানে দেওয়া নেওয়া হয়। তুরি জাতির বিবাহে ‘ঘি ঢারি’ প্রথা রয়েছে। মেয়ের বাবা-মা,দাদা-বৌদি ,কাকা -কাকি বর কনের মতো সেজে বিবাহের আচার পালন করেন। শুধু সিঁদুর দান অনুষ্ঠানটি হয় না।

তুরি জাতির বিবাহ শুরু হয় ভোর রাতে। গাঁট বন্ধন করার পর সিঁদুর দান অনুষ্ঠান হয়। টাকায় বা শন দিয়ে সিঁদুর পরানো হয়। ভাসুর কাপড় দিয়ে কনের মাথা ঢেকে দেন। বিবাহ শেষে বর-কনেকে মিষ্টি জল খাওয়ায়।এরপর বাঁদানির অনুষ্ঠান বসে। বর-কনে বিদায়ের সময় কুলোতে চাল নিয়ে কনে মায়ের আঁচলে সেই চাল ফেলে ঘর পূরণ করে এবং খৈ ছড়ানো অনুষ্ঠান হয় ।

সামাজিক রীতিনীতি : তুরি জাতির সামাজিক রীতিনীতিগুলি হল-

১.তুরি সমাজের বিবাহ অনুষ্ঠান পূর্বে নাপিতরা সম্পন্ন করতেন ।বর্তমানে নাপিতদের পরিবর্তে ব্রাহ্মণ পুরোহিত বিবাহ কার্য সমাধা করছেন।

২. সমাজে বহু বিবাহ প্রথা রয়েছে। একজন লোক যতগুলি স্ত্রীর ভরণ পোষণের ভার বহন করতে পারবে সে ততগুলি স্ত্রী রাখতে পারবে।

৩. বিবাহের পূর্বে মাদলওয়ার এবং সুরিনওয়ার –এর মতামত নিতে হয়। এরা যথাক্রমে রাজা এবং ঠাকুর । কনের মূল্য হিসাবে পূর্বে দুই- আট টাকা দিতে হোত। গ্রামীন পাহান যোগদান করেন।

৪. সাগাই রূপে বিধবা বিবাহ করতে পারে। সাধারণত স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর একটি ছোট ভাই থাকলে বিধবা বৌদি তাকে বিবাহ করতে পারে। এক্ষেত্রে ‘সাগাই’ অনুষ্ঠানে সিঁদুর ব্যবহৃত হয় না।তুরি সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ গ্রাহ্য।

৫. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আত্মীয়দের মধ্যে যিনি প্রধান তাঁর মতামত গ্রহণ করা । কনেকে নতুন বস্ত্রদান করা হয়। লাক্ষার তৈরি বাহুবন্ধন উপহার দেওয়া হয় ।

সমাজ অনুশাসন পদ্ধতি : তুরি সমাজের লোকেদের আত্মীয়দের যিনি প্রধান তার মতামত নিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করে। এই জাতির লোকেরা গ্রামের ‘ষোল আনা’ কমিটির নির্দেশমতো সামাজিক কাজকর্ম সম্পাদন করেন। নানা সমস্যা সমাধানের জন্যও এই কমিটির পরামর্শ মতামত মানতে হয় । সমাজের বিভিন্ন মানুষের সমস্যার সমাধান করেন। বর্তমানে সুবিচারের জন্য পঞ্চায়েতের দ্বারস্থ হয় ।

ট্যাবু বা নিষেধাজ্ঞা : কাশ্যপ গোত্রধারী তুরি জাতি কচ্ছপ খায় না। নাগ গোত্রের লোকেরা সাপ মারে না।

লোক উৎসব : তুরি জাতির নর-নারীরা উৎসব-পার্বণে অংশগ্রহণ করে থাকে । এদের প্রধান উৎসব মনসা পূজা। হাঁস,পায়রা,ছাগল পাঁঠা পূজার পর বলিদান দেয়। এছাড়াও এরা ভাদু,টুসু,করম,গাজন ইত্যাদি লোকউৎসবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

ভাষা : তুরি জাতির লোকেরা খোট্টা ভাষায় কথা বলে। কুড়মি জাতির ভাষা কুড়মালির সাথে এই ভাষার অনেকটা সাদৃশ্য রয়েছে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারা : সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে এরা পিছিয়ে পড়া জাতি। এদের জীবিকা অর্জনের পথ সীমিত। কৃষিযোগ্য জমি এদের বিশেষ নেই। বনভূমি থেকে বাঁশ সহজলভ্য নয়। বাজার থেকে বাঁশ কেনার সামর্থ্য অনেকের নেই। বাজারে তাদের তৈরি জিনিসের চাহিদাও কম। বর্তমানে প্লাস্টিক,ফাইবারের জিনিসপত্র ঘরে ঘরে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর ফলে এই জাতির লোকেদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। এরা সংখ্যায় অল্প হলেও এদের মানোন্নয়নের যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার আলোয় এদের শিশুদের আনা হচ্ছে। এদের জীবিকার পথগুলোকে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। যার ফলশ্রুতি এদের মধ্য থেকেই উঠে আসছে জেলার বিভিন্ন স্থানে সরকারি কাজের উপযুক্ত কর্মী।

ক্ষেত্র সমীক্ষার ওপর নির্ভর করে পুরুলিয়া জেলার কয়েকটি সংখ্যা গরিষ্ঠ তফসিলি জাতির পাশাপাশি কয়েকটি সংখ্যায় কম এমন জাতির সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয় আলোচনা করেছি। পুরুলিয়ার বেশির ভাগ তফসিলি জাতির মানুষ গ্রামে বসবাস করে্ন। এদের জীবনে গ্রামীণসংস্কৃতি বিদ্যমান।

১. প্রত্যেক জাতির উৎপত্তির নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস ভিন্ন ভিন্ন। জাতির মধ্যে ছোট ছোট সম্প্রদায়- উপসম্প্রদায় রয়েছে। বিভাগ-উপবিভাগ রয়েছে। রয়েছে নানা গোত্র। আবার বিভাগ-উপবিভাগ ও গোত্র উপগোত্র-এর মধ্যে পার্থক্য চোখে পড়ে। চেহারায় রয়েছে কিছু পার্থক্য।

২. বর্তমানে এদের ঘর-বাড়ি, ব্যবহারিক আসবাবপত্র এবং দ্রব্য সামগ্রী যেমন একই রকম ব্যবহার করে আবার তেমনি ব্যবহারের মধ্যেও বৈচিত্র্য চোখে পড়ে।এইসব লোক তৈজসপত্র ব্যবহারে এদের জীবনে এসেছে বৈচিত্র্য যা গবেষণায় তুলে ধরেছি।মাটির হাঁড়ি,কলসি ছাড়া আর কোনো তৈজসপত্র দেখা যায় না। বর্তমানে মাটির দ্রব্যের স্থান দখল করেছে অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি, লোহার কড়াই,স্টীলের থালা,কলসি,বাটি,গেলাস ,চীনামাটির কাপ,প্লেট প্রভৃতি।

৩. গ্রামাঞ্চলে পুরুষরা ধুতি,লুঙ্গি,গেঞ্জি পরে ঘুরে বেড়ায়। মাথায় গামছা দিয়ে পাগড়ি বানায়।বর্তমানে বাড়ির বউ-বইঝি,বিবাহিতা-অবিবাহিতা নারীরা শাড়ি,শায়া , ব্লাউজ পরিধান করে। বিশেষত সাপটা দিয়ে শাড়ি পরে নারীরা। তবে এদের পোশাক-আশাক-এ কোনো আভিজাত্য নেই। ঔজ্জ্বল্য বর্ণের। শিশু ছেলে-মেয়েদের,যুবক-যুবতীদের নতুন ডিজাইনের পোশাকের দিকে ঝোঁক বাড়ছে। কুমারী মেয়েরা কুর্তি, ট্রাউজার, জিনস;চুমকি, পাথর দেওয়া ঝলমলে শাড়ি পরতে ভালোবাসে। যুবকরাও বিভিন্ন ধরনের প্যান্ট, জামা, গেঞ্জি পরে। রুচিগত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে।

৪. পূর্বে ধানের ফলন ভালো ছিল না। ভুট্টা,জোয়ার বা মকাই সেদ্ধ বা মাইলো খেয়ে পেট ভরাত। এখন সমস্ত মানুষের প্রধান খাদ্য ভাত। ডাল,মাছ,মাংস,শাক-সব্জি তাদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে। এর সঙ্গে মহুয়া,হাঁইড়্যা,দেশি মদ প্রভৃতির নেশায় পুরুষ জাতি ডুবে থাকে।

৫. পূর্বে জাতি সৃষ্টি হয়েছিল জীবিকার ভিত্তিতে। তবে বর্তমানে জীবিকার পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন- বাউরি জাতির পূর্বেকার জীবিকা ছিল পালকি বহন করা অর্থাৎ বেহারাগিরি করত। পালকি বর্জিত হওয়ার পর কেউ রিকশা ,ঠেলা চালায়, ক্ষেত মজুর,মাটিকাটা শ্রমিকের কাজ করে। মেয়েরা লোকের বাড়িতে কামিনগিরি করে। জীবিকাগুলির মধ্যে দেখা যাচ্ছে মিশ্রণ। বংশানুক্রমিক ধারায় তাদের পূর্ব পুরুষদের জীবিকার ধারা বহন করা সম্ভবপর হচ্ছে না। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে রুচি,পেশার পরিবর্তন ঘটেছে।

৬. বিবাহ রীতির মধ্যে কিছু মোটিফ তত্ত্ব রয়েছে। যেমন- বাউরিদের বিয়েতে কলাগাছ পুঁতবার রীতিটি। বর আমগাছকে বিবাহ করে আর কনে কলাগাছ বিয়ে করে। তারপর কনের সাথে কলাগাছটিকেও শ্বশুর বাড়ি পাঠানো হয়।

বর-কনে দুজনে মিলে সেই কলা গাছটি মাটিতে পুঁতে দেয়। আর কলা গাছটির ফলনের সাথে সন্তান সন্ততি লাভের কামনা মিশে থাকে ।

৭. বিবাহ এবং জন্ম-সংস্কার দুটি ক্ষেত্রেই ডিম দিয়ে পূজা দেওয়ার রীতি রয়েছে পুরুলিয়ার তফসিলি জাতিদের মধ্যে । ডিম উর্বরতার প্রতীক। তাই শুভ কাজে ডিম অপরিহার্য।

৮. তফসিলি জাতিদের মধ্যে আকন্দ ফুল ও গুয়া সুপারির মালা বদলের মধ্য দিয়ে বিবাহ সম্পন্ন হয়। আকন্দ ফুল,সুপারি,পৈতা-এই তিনটি জিনিস শিবের সাথে যুক্ত। এই রীতির মধ্য দিয়ে শিব-দুর্গার মতোই স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনের দৃঢ়তা প্রমাণ করে।

৯. প্রতিটি তফসিলি জাতির মধ্যেই বিবাহে চিঁড়া-গুড় খাওয়ানোর রীতি রয়েছে। মঙ্গল অনুষ্ঠানে চিড়ের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে আর মৃত্যু-সংস্কারে মুড়ি,খই ব্যবহার করে।

১০. শিব,মনসা,শীতলা,গ্রামদেবতা প্রভৃতি তাদের লৌকিক দেব-দেবী। তফসিলি জাতির বেশিরভাগ মানুষ হিন্দু ধর্মাবলম্বী। এছাড়াও মুসলিম,খ্রীষ্টান,বৌদ্ধ ধর্মের মানুষ রয়েছেন। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর মানুষের সংখ্য কম।

১১. বেশিরভাগ মানুষ 'মানভুঁইয়া' ভাষায় কথা বলে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছেলে মেয়েরা বাংলা,ইংরাজী,হিন্দি ভাষায় লেখাপড়া করছে। এই ভাবে তফসিলি জাতির ধর্মীয় সামাজিক জীবন ও নৃতত্ত্বগত পরিচয় গবেষণার মধ্য দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

ছোটনাগপুর অঞ্চলকে বলা হয় 'ভারতের খনিজ ভাণ্ডার'। অনুরূপ চিন্তা নিয়ে যদি বলি 'পুরুলিয়া লোকসংস্কৃতির এক অফুরন্ত ভাণ্ডার', তাহলে বোধ হয় এটা অত্যুক্তি করা হবে না । এই জেলার লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহক রূপে যারা এখনও গতিশীল সমাজের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চলেছে এরা হল এখানকার তফসিলি জাতি ।
এই জেলায় রয়েছে বহু বিচিত্র ধরনের তফসিলি জাতি । তাদের কোনোটি সংখ্যাগরিষ্ঠ। কোনোটি সংখ্যা কম আবার কোনো জাতির অস্তিত্ব অবলুপ্তির পথে ।

ক্ষেত্র সমীক্ষার নানা স্তরে বিভিন্ন তফসিলি জাতির মানুষদের সঙ্গে আলাপ করেছি । বসেছি মুখোমুখি । কখনো পাশাপাশি । আলাপচারিতায় এদের কাছ থেকে পেয়েছি সহজ -সরল উত্তর । জেনেছি তাদের নিজ নিজ সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-আচরণ। দেখেছি নিজ নিজ পেশায় এরা কাজ করে চলেছে । মেয়েরাও রয়েছে এদের সাথে । এমনকি ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও বাদ যায় নি । পূজা-পার্বণ,উৎসব-অনুষ্ঠানে ওদের আমন্ত্রণে পৌঁছে গেছি ওদের ঘরে, কখনও মন্দির প্রাঙ্গণে । কখনও মেলার ভিড়ে মিশে গেছি । ওদের সাথে আনন্দে মেতে উঠেছি । কোথাও ওদের সাজে সেজেছি। কোথাও ওদের ভাষা ও সুরে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়েছি । কোথাও ওদের হাতে হাত মিলিয়ে নেচেছি । এসবের এক আলাদা অনুভূতি, অভিজ্ঞতা শিহরণ জাগায় আমার মনে । ওদের খাদ্যাভ্যাস, ঘর-বাড়ি, পোশাক-আশাকের মধ্যে দারিদ্র্যের ছাপ প্রতি মুহূর্তেই ফুটে উঠেছে । শিক্ষার অভাব, অন্ধ-কুসংস্কার, অভাব-অনটনে কাটানো দারিদ্র্যের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত মানুষদের দেখে আমার মন হয়েছে ভারাক্রান্ত আর বেদনাবিধুর ।

বর্তমানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এদের জীবনের মানোন্নয়নের এগিয়ে এসেছে । প্রকল্প রূপায়ণের মধ্য দিয়ে জীবনধারার বদল ঘটিয়েছে । এদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন দেখে আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছি । জীবন নব আনন্দে ভরে উঠুক –এই এক রাশ আশা নিয়ে বিদায় নিয়েছি ওদের কাছ থেকে ।

তথ্যসূত্র নির্দেশ:

1. ‘ বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন’,ড. অতুল সুর, সাহিত্যলোক,৩য় সংস্করণ, পৃ- ২০৭।
2. ‘ The People Of India’,H.H.Risley, page-67
3. ‘বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন’,ড. অতুল সুর, ৩য় সংস্করণ,পৃ-২০৬।
4. ‘ বাঁকুড়া’, তরুণদেব ভট্টাচার্য,১ম প্রকাশ-১৯৮২,পৃ.-২০৯।
5. ‘চর্যাগীতিকোষ’, নীলরতন সেন,১ম প্রকাশ ১৯৭৮,পৃ- ১১।

ঋণ স্বীকার:

1. গায়ত্রী দাস (রুহিদাস) (৩৫) গোপলাডি, চাকলতোড়, পুরুলিয়া।
2. দীপালি বাউরি (৪০), শিং বাজার, পুরুলিয়া ।
3. দেবদাস বাগদি, (৪৭), আশু সহিস লেন,পুরুলিয়া ।
4. ধরণ বাদ্যকর (৩২), দুমদুমি, পুরুলিয়া।
5. পিন্টু সহিস (৩২), পুরুলিয়া।
6. বংশী ধীবর (৬৫),সরিষাবাড়ি, পুরুলিয়া।
7. বাদল রাজোয়াড় (৩৪), নামো সুরুলিয়া, পুরুলিয়া মফঃস্বল।
8. বেলা জালিয়া কৈবর্ত (৪২), চাকলতোড়, পুরুলিয়া।
9. বেলা কৈবর্ত (৭০), নিশ্চিন্তপুর,রঘুনাথপুর -১, পুরুলিয়া ।
10. ভাদি বাউরি (৬০), শিং বাজার , পুরুলিয়া।
11. মন্টু ধীবর (৩৬), সরিষাবাড়ি,পুরুলিয়া।
12. মাদুলি দাস (৪৫), কর্পূরবাগান,পুরুলিয়া।
13. মিতালি লোহার (৫২), বলরামপুর,গোশালা,পুরুলিয়া।
14. রজনী রজক (৪৬), ধোবাডি,পুরুলিয়া।
15. রবি মাল (৩৫),ধোবঘাটা,পুরুলিয়া।
16. রেবতী ভুঁইয়া (৫০), ভুঁইয়া পাড়া, পুরুলিয়া।
17. হারু বাদ্যকর (৩৪), দুমদুমি,পুরুলিয়া ।
18. সত্যবান মন্ডল(৪৫), বাইকাটা , পুরুলিয়া।
19. সরস্বতী ভুঁইয়া (৪৫), ভুঁইয়া পাড়া, পুরুলিয়া।
20. সরিতা তুরি (৩৫), নিতুড়িয়া, পুরুলিয়া।
21. সুদাম রাজোয়াড় (৪০), বোঙ্গাবাড়ি, পুরুলিয়া।
22. সুজিত মাছোয়ার (৪০), ঘাসিকুলি,ঝালদা,পুরুলিয়া